জংলিমহল

সাহিত্যম্ ।। ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক :
শ্রী নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৭

মুদ্রক :
প্রিন্টিং সেণ্টার
১, ছিদাম মুদি লেন,
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : অনির্বাণ গাঙ্গুলি

বর্ণগ্রন্থন :
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

অশোক দাশগুপ্ত
প্রিয়বরেষু
লালাদা

সাহিত্যম্ প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

- চান্দ্রায়ণ
- সম
- চারকন্যা
- চারুমতি
- সারস্বত
- দুটি উপন্যাস
- রাগমালা
- বাসনাকুসুম
- মাণ্ডুর রূপমতী
- বইমেলাতে
- দু'নম্বর
- নগ্ন নির্জন
- ছ'টি উপন্যাস
- পাখসাট
- পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প
- বাংরিপোসির দু'রাত্তির
- ছৌ
- জগমগি
- যুযুধান
- বাতিঘর
- পরিযায়ী
- ছায়ারা দীর্ঘ হলো
- ঋজুদার সঙ্গে সেশ্যেলস্-এ
- তিন ঋজুদা
- দু'টি ঋজুদা কাহিনী
- আরও তিন ঋজুদা কাহিনী
- ঋজুদার চার কাহিনী
- ঋজুদার যুগল অ্যাডভেঞ্চার
- চার ঋজুদা
- বাবলি

কৈফিয়ত

'জঙ্গল মহল'-এর 'উত্তরপর্ব' লেখার প্রস্তাবটি পেয়ে অবধি উত্তেজিত এবং কিঞ্চিৎ বিপদগ্রস্তও বোধ করেছি। 'জঙ্গল মহল'-এর মতো বইয়ের উত্তরপর্ব লেখা তো সহজ কথা নয়। আমি বদলে গেছি, আমার ভাষা বদলে গেছে, দেখার চোখও বদলে গেছে। যাওয়াই স্বাভাবিক। রসিক পাঠকমাত্রই এ কথা বুঝবেন আশা করি।

'জঙ্গল মহল' আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত কয়েকটি মজার গল্পের সঙ্কলন। শিকারের পটভূমিতে লেখা হলেও গল্পগুলি যতখানি 'শিকার' সম্বন্ধীয়, তার চেয়ে বেশি 'স্বীকার' সম্বন্ধীয়। এই গল্পগুলিতে শিকারিকে নায়ক করা হয়নি, বরং তাকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতাই করা হয়েছে। বাংলা ভাষাতে ঠিক এ ধরনের লেখা সম্ভবত খুব বেশি লেখা হয়নি। এই গল্পগুলি একের পর এক লেখা সম্ভব হয়েছিল রবিবাসরীয় সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রমাপদ চৌধুরির আগ্রহ এবং বদান্যতায়। এই সব গল্প লিখেই বাঙালি পাঠকসমাজের কাছে আমার পরিচিতি এবং এ জন্যে আনন্দবাজার এবং রমাপদবাবুর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বইটি প্রথম প্রকাশ করেন শ্রদ্ধেয় মনোজ বসুর অংশীদার শ্রদ্ধেয় শ্রীশচীন মুখোপাধ্যায়, তাঁর প্রকাশনা সংস্থা 'বাক্ সাহিত্য' থেকে। সম্ভবত সত্তর দশকের গোড়াতে অথবা ষাটের দশকের শেষে। প্রথম সংস্করণের কোনও কপি আমার কাছে নেই। তাই সঠিক বলা সম্ভব নয়। ওটিই আমার প্রথম গদ্যগ্রন্থ। 'জঙ্গল মহল'-এ গ্রন্থিত গল্পগুলি যখন রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়, তখনও প্রত্যেকটি গল্পের অলঙ্করণই করিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীরমাপদ চৌধুরি মশায় শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীর মৈত্র মশায়কে দিয়েই। ওই বইয়ের প্রচ্ছদটিও তাঁরই করা। আমার মনে হয়, 'জঙ্গল মহল'-এ আমার লেখা গল্পগুলির চেয়ে সুধীরবাবুর প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ গুণমানে অনেকই উঁচু।

'জঙ্গল মহল' লিখেছিলাম জঙ্গলের কিছু কিছু মজাদার ঘটনা নিয়ে। এবং

সেই বই অত্যন্তই সমাদৃতও হয়েছিল। আজও অনেকে বলেন যে, 'জঙ্গল মহল' আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। এই 'জংলি মহল' লিখছি কোনও কোনও মানুষকে নিয়ে, অবশ্যই বন-জঙ্গলের পটভূমিতে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় এবং যাবতীয় লেনদেন। সেই সব মানুষের কেউ কেউ 'জঙ্গল মহল'-এও উপস্থিত আছেন। এবং আছেন আমার আত্মজৈবনিক লেখা, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে। সে কারণেই এই লেখাতে কিছু কিছু পুনরোক্তি ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। আশা করি, পাঠককুল এই দোষ ক্ষমা করে নেবেন নিজেদের রসবোধের গুণে।

যাঁদের কথা এই রচনাতে আছে সেই সব মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আজ আর ইহলোকে নেই। তাই এই লেখা, চলে-যাওয়া সেই সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতিতর্পণও বটে।

জঙ্গল মহলের উত্তরপর্ব লেখা হল না, কারণ, তা লেখা অসম্ভব। এই লেখার নাম দিলাম 'জংলি মহল'।

জংলি মহল

গোপাল

আজ কলকাতায় বৃষ্টি নেমেছে বহুদিনের প্রতীক্ষার পরে। কিছুক্ষণ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির পরে এখন ফিসফিস করে বৃষ্টি পড়ছে। ছোটনাগপুর মালভূমিতে, মুন্ডারীদের 'সোনারূপান রূপালেকান ছোটা নাগাপুরাহো, ছোট নাগাপুরা'তেও বৃষ্টি এমনই ফিসফিসিয়ে পড়ে।

আমার হাজারিবাগের শিকারের বন্ধু গোপাল সেন। ওদের গয়া রোডের (এখন যার নাম বড়হি রোড) বাগান-ঘেরা 'পূর্বাচল' বাড়ির পশ্চিমমুখো বারান্দাতে এমনই এক বৃষ্টির দিনে আমি আর গোপাল বসে আছি। ইউক্যালিপটাস গাছেদের বৃষ্টি-ভেজা গা থেকে সুন্দর ঝাঁঝাল গন্ধ উড়ছে।

আমরা দুজনে সামনের দিকের যে ঘরে দুটি নেয়ারের খাটিয়াতে শুতাম, তার সামনেই একটি মস্ত ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার গাছ ছিল। তাতে ফুল এসেছে। সেই গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে। সামনের পিচরাস্তার ওপারে তখন মস্ত এক মোরব্বা ক্ষেত ছিল। এখন বনবিভাগ সেখানে বড় গাছের প্লান্টেশন করেছে। মোরব্বা মানে, সিসাল হেম্প—যা দিয়ে দড়ি তৈরি হত। সেই মোরব্বা ক্ষেত তিতির, খরগোশ আর নানা সাপের আড্ডা ছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা দুজনে বিকেলবেলা বন্দুক কাঁধে বেরোব। তিতির বা খরগোশ মারতে পারলে আমিষ। নয়ত খিচুড়ি। প্রায় দু'বেলাই খিচুড়ি খেতাম।

গোপাল একটি বেতের চেয়ারে বসে অন্য চেয়ারে পা তুলে দিয়ে পায়জামাটা হাঁটু অবধি তুলে বিড়ি খেতে খেতে (সিগারেটকে ও বিড়ি বলত) ওর স্বভাবসিদ্ধ ইয়ার্কির সঙ্গে গাইছে 'ওগো তোরা কে যাবি পারে। আমি তরী লিয়ে বইস্যে আচি লদী কিলারে—এ—এ'।

পূর্বাচলের পাশের বহু বিঘা হাতাওয়ালা প্রাচীন সব গাছে-ছাওয়া হক সাহেবের বাড়িতে অভিনেত্রী মঞ্জু দে একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কলকাতা থেকে ভরা বর্ষাতে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। প্রায়ই আসতেন। তবে বাড়ির মধ্যে একবার সেঁধিয়ে গেলে তাঁদের আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না। মঞ্জু দে সে সময়ের তুলনাতে একজন দুঃসাহসী মহিলা ছিলেন। সমাজকে ডোন্ট-কেয়ার করার মতো দুর্জয় সাহস তাঁর ছিল। অনেক বছর পরে অপর্ণা সেন এবং তসলিমা নাসরিণ-এর মধ্যে এই দুঃসাহসের রেশ দেখতে পেয়েছি। খাতা কলমে নারীবাদী অনেকেই কিন্তু জীবনে নারীবাদী হতে সাহস লাগে, যে সাহস অনেক পুরুষের মধ্যেও দেখা যায় না।

গোপালের বাবা বিলেতের ইনকর্পোরেটেড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। ওঁরও নিজস্ব ফার্ম ছিল—মেসার্স জে সেন অ্যান্ড কোং। গোপালও সে কারণেই আমারই মতো ওর বাবার ফার্মে আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ত। ও-ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি কম পাস করেছিল। আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিল। পরে গোপালও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছিল।

তখনকার দিনে দশটা গাধা মরে একটা বড় ছেলে হত। এবং বড় ছেলেরা কী করবে বা করবে না সে সিদ্ধান্ত বাবাই নিতেন। তাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নই উঠত না। ওর ভাল নাম ছিল মিহির সেন। তবে তখন আমাদের দুজনেরই হোল-টাইম অকুপেশন ছিল যার যার বাবার অফিসে সবুজ পেন্সিল দিয়ে বিভিন্ন মক্কেলের ক্যাশবুক লেজার আর জার্নালের পোস্টিং চেক করা, সি এ পরীক্ষাতে ফেল করা এবং অন্তর্বর্তী সময়ে হাজারিবাগে বা অন্যত্র শিকারের জন্যে যাওয়া।

গোপাল ফ্লাইং মারত দারুণ। ওদের মক্কেল ছিলেন হাওড়ার দাশনগরের আলামোহন দাশ। তাঁর তিন ছেলেই, প্রভাত, রবি ও চাঁদু গোপালের এবং গোপালের মাধ্যমে আমারও বন্ধুস্থানীয় ছিল যদিও বয়সে ওরা তিন ভাইই ছোট ছিল আমার চেয়ে। বড় ভাই শিশিরদা আলাদা থাকতেন। প্রভাত ছিল মেজ ছেলে। খুবই অল্পবয়সে সে হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা যায়। ওর মতো উদার-হৃদয়, সদাহাস্যময়, প্রকৃত স্পোর্টসম্যান জীবনে কমই দেখেছি।

দাশনগরে ওরা একটি গান-ক্লাব করেছিল। পুরো পূর্বভারতে তখন আর কোনও গান-ক্লাব ছিল বলে জানি না। সেখানে ট্র্যাপ ও স্কিট শুটিং প্র্যাকটিস

করত ওরা। আমিও গোপালের সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতাম। এখন যে আর্মি অফিসার রাঠোর অলিম্পিকে সোনার মেডেল পাচ্ছেন তা ওই ট্র্যাপ ও স্কিট শুটিংয়েই। রাঠোরের যে বন্দুকটির ছবি আপনারা কাগজে ও টিভিতে দেখেন এবং যা মাঝে হারিয়ে যাওয়াতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল, তার নাম 'ওভার-আন্ডার'। সাধারণত দোনলা বন্দুকের দুটি নল পাশাপাশি থাকে, কিন্তু ওভার-আন্ডারের নল থাকে ওপর-নিচে। রাজা-মহারাজারা ওই সব বহুমূল্য বন্দুক আমদানি করতেন। ট্র্যাপ ও স্কিট শুটিংয়ের অনুশীলনে যে পরিমাণ বন্দুকের গুলি খরচ হত তার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। প্রভাত দাশ এবং আমাদের আরেক শিকারি বন্ধু ও অনুজ, আসানসোলের নর্থব্রুক কলিয়ারির প্রণব রায়, অলিম্পিকের ট্রায়ালে যেত দিল্লিতে। একবার ঋতুর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম থাকায় এবং আমারও পেশার কাজ থাকাতে ঋতুকে নিয়ে দিল্লিতে যখন গিয়েছিলাম তখন সফদরজং এয়ারপোর্টের কাছে শুটিং রেঞ্জে অলিম্পিকের ট্রায়াল হচ্ছিল। গোপাল, প্রভাত এবং তার ভায়েরা, বিকানিরের মহারাজা, বিকানিরের রাজকুমারী, কোটার মহারাজা এবং আরও অনেক রাজা-মহারাজারা সেই ট্রায়াল-এ বেশ অনেকদিন প্র্যাকটিস করতে যেতেন। রাজকুমারী অবশ্য এয়ার-রাইফেল ছুঁড়তেন, বন্দুক নয়।

তখন আকাশবাণীর সব ন্যাশনাল প্রোগ্রামই হত দিল্লির আইফ্যাক্স হল-এ। সেখান থেকে সারা ভারতের বিভিন্ন আকাশবাণী কেন্দ্রে রিলে করে সেই অনুষ্ঠান শোনানো হত। ষাটের দশকের মাঝামাঝির কথা বলছি। মনে আছে, ঋতু 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী' গানটি গেয়েছিল। বিমানদা (বিমান ঘোষ) আকাশবাণীর আর্কাইভ থেকে টেপ দিয়ে ওকে খুব সাহায্য করেছিলেন। ওই গানটি শান্তিনিকেতনের সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণান খুব ভাল গাইতেন। ঋতু গাইবার পরে অবশ্য অনেকেই সেই গানটি গেয়ে থাকেন।

প্রভাতই জোর করে ঋতুকেও যেতে বলত ট্রায়াল দেখতে। তখন দিল্লিতে এত হোটেল ছিল না। আমরা উঠেছিলাম নবনির্মিত জনপথ হোটেলে। কোটার মহারাজার বাড়ি ছিল কাছেই। যাওয়ার সময়ে আমরা ট্যাক্সিতে যেতাম। ফেরার সময়ে উনিই আমাদের নামিয়ে দিতেন। সেই প্রথম কোনও ফ্লুইড-ড্রাইভ গাড়িতে চড়ি। ফ্লুইড-ড্রাইভ মানে, যে গাড়িতে গিয়ার থাকে না, অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলেই গাড়ি চলে।

প্রভাত, প্রণব এবং গোপাল তিনজনই স্কিট ও ট্র্যাপ প্র্যাকটিস করে করে এমনই হাত করেছিল যে কোনও হাঁকোয়াতে কোনও পাখি একবার উড়লে সে ওপর দিয়েই উড়ুক কি নিচ দিয়ে, তার আর রক্ষা ছিল না। গান ক্লাবে যেমন বলে 'পুল' আর অমনি মাটির তৈরি ডিস্ক মেশিন থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রচণ্ড বেগে শিকারেও কোনও পাখি উড়লে কেউ বলত 'বার্ড' আর পরক্ষণেই গুলি ছুটত আর সে পাখি ধরাশায়ী হত। যারা ট্র্যাপ ও স্কিট শুটার তারা বাহু ও কাঁধের সন্ধিতে লাগিয়ে বন্দুক ছোঁড়েন না, উরুর ওপরে বা কোমরে বন্দুকের BUTT রেখে ট্রিগার টানেন।

গোপাল অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিল। ভাল ছবি আঁকত। ভাল ফটোগ্রাফার ছিল। সোসাইটি অফ কনটেমপোরারি আর্টিস্টস-এর জন্মলগ্ন থেকে গোপাল তার অডিটর ছিল। শ্যামলদা (দত্ত রায়), অনিলদা (অনিলবরণ সাহা) এবং আরও অনেক চিত্রকরের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা ছিল। ওর সঙ্গে সোসাইটির প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের অফিসেও গেছি বহুবার এবং অনেক চিত্রীর সঙ্গে আলাপিতও হয়েছি। তখন অনিলদার বাড়িতেই অফিস ছিল সোসাইটির, যতদূর মনে পড়ে। গোপাল খুব সুন্দর চিঠিও লিখত। চিঠির মধ্যেই ছবি আঁকত। প্রতি বছরই হাজারিবাগ থেকে ও বিজয়ার চিঠি লিখত আমাকে একটি করে। আজ ই-মেইল আর মোবাইল-এর দিনে সেই সব চিঠির দিনের কথা মনে হলে মন ভারি হয়ে ওঠে।

ওই আমাকে আতরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করায় হাজারিবাগে। এক জাপানি চিত্রকর হাজিমিসো জাপান থেকে এসে গোপালের খুব বন্ধু হয়ে যায়। সে আমাদের সঙ্গে জঙ্গলেও যেত। পরে সে নেপালে গিয়ে খুবই অল্পবয়সে মারা যায়। তার মা-বাবার আমন্ত্রণে গোপাল পরে একবার জাপানে যায়। আমি জাপানে গেছি তার অনেক আগে। জাপান থেকে ফিরে হাজারিবাগের 'পূর্বাচলের' সামনের বাগানে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাড়ির পেছনে যেমন আছে তেমন একটি জাপানিজ গার্ডেনও করে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও খুবই ভক্ত ছিল ও। ছাত্রাবস্থায় ওর ট্রায়াম্ফ গাড়ির মধ্যে বসে অথবা ফুটপাথে খবরের কাগজ বিছিয়ে সারারাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনেছি আমরা। এই অগায়কের রবীন্দ্রসঙ্গীতও গোপাল খুব ভালবাসত। বর্ষার দিনে অর্ডার করে করে 'বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল',

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে গগনে গগনে ডাকে দেয়া', 'পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা' ইত্যাদি গান শুনত। হাজারিবাগে এক বর্ষার রাতে ওর সেতারী বন্ধু, উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের শিষ্য পণ্ডিত দেবু চৌধুরি, আমি আর গোপাল, রাতে খিচুড়ি আলুভাজা আর ডিমভাজা খেয়ে দেবুর বাজনা শুনতে বসলাম। চতুর্থ কেউ ছিল না। দরবারী দিয়ে শুরু করে রাত শেষে ভৈরবী দিয়ে শেষ করল। সারারাত বাইরে বৃষ্টির ফিসফিসানি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক-এর কাজ করল। কোনও তবলিয়াও ছিল না। দেবু পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও সম্ভবত পদ্মবিভূষণও হয়েছিল পরে। তবে সাহিত্য, গান-বাজনা এবং অন্যান্য অনেক পুরস্কারই শুধুমাত্র গুণেরই কারণে দেওয়া হয় না। তাই ও আমাদের বন্ধু হলেও পদ্মবিভূষণটা বাড়াবাড়িই ঠেকেছিল আমাদের চোখে।

সেইসব দিনের কথা মনে হলে মন বড় ভারি হয়ে আসে। যখনই একা থাকি, তখনই সময়ে সময়ে মনে হয়, গোপাল দুবার ওর স্মোকার্স কাফ কেশে পেছন থেকে বলছে, লালসাহেব? কী করছ?

প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় ও দুরন্ত সাহসে দুই বন্ধু, সঙ্গে কোনও জংলি অনুচর নিয়ে বন্দুক আর টর্চ নিয়ে সারারাত পায়ে হেঁটে শিকারের খোঁজে গভীর জঙ্গল ও টাঁড়ে ঘুরে জীবনীশক্তির শেষ বিন্দু খরচ করে 'পূর্বাচল'-এ ফিরতাম ভোরের আলো ফুটলে। কোনওদিন শিকার হত, কোনওদিন খালি হাতেই ফিরতে হত। আমি ফিরেই বন্দুক গান-র‍্যাকে রেখে হাত-পা ধুয়ে শুয়ে পড়তাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যেতাম। প্রচণ্ড শৌখিন গোপাল অত্যন্ত স্নানবিলাসী ছিল। যখনই ফিরুক না কেন, গরম জলে স্নান করে গায়ে পাউডার আর পারফিউম ছিটিয়ে জাপানিজ কিমোনো পরে সে রান্নাঘরে যেত। 'পূর্বাচলের' রান্নাঘরটি ছিল দেখার মতো। গোপালের মা, মাসীমা, অত্যন্তই লক্ষ্মী মহিলা ছিলেন। তাঁর রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর সত্যিই দেখার মতো ছিল। যদি কোনও শিকার হত, দিনের বেলা হলে, মুরগি, তিতির, কালি তিতির, খরগোশ, রাতের বেলাতে কোটরা হরিণ, শুয়োর বা অন্য কিছু, চান করার আগে তার MAN FRIDAY চমনলাল এবং প্রয়োজনে আমাদের তৈলমর্দনকারী, ভূত ও ডাকাতের গা-শিউরানো গল্প-বলা হাজাম মহাবীর এবং মালি করমের সাহায্যে সেই

মৃত জানোয়ার স্কিন করে কেটেকুটে নিজে হাতে রান্না করত। স্কিনিং বা কাটাকুটির মধ্যে আমি কোনওদিনই থাকতাম না। পাখিই হোক, শম্বরই হোক কী বাঘ বা লেপার্ডই হোক রক্ত আমি দেখতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে ভণ্ড বলতেন। আজ বুঝি যে, আমি ভণ্ড ছিলাম না কিন্তু শিকারি হলেও আমার মধ্যে একজন কবি ছিল। অথবা WALT WHITMAN-এর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়, 'Do I contradict myself ? Very well Then, I do contradict myself. I contain multitudes.' গোপাল তার স্বাভাবিক ঔদার্যে এ নিয়ে কখনও অনুযোগ করত না। রান্না হলে খাবার ঘরের টেবিলে খাবার সাজিয়ে আমাকে নিজে ডাকতে আসত, অথবা চমনলালকে পাঠাত। ঘুম থেকে তুলে বলত, চলো, লালা, খাবে চলো। ও কত যে নিজস্ব সব নাম দিত এক-একটি পদের তা কী বলব! অ্যামেরিকান, রাশ্যান, চাইনিজ, জ্যাপানিজ, বার্মিজ, থাই নামের ফুলঝুরি ফুটত—আর তেমন স্বাদুও হত সেই সব পদ।

শিকার হলে, পূর্বাচলের লাগোয়া একটি দারুণ সুন্দর দোতলা বাড়ির অতি-বৃদ্ধ কেয়ারটেকার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিস্টার স্মিথকে রান্না-করা খাবার গোপাল অবশ্যই পাঠাত। স্মিথ সাহেবও খুবই ভালবাসতেন গোপালকে। মাঝে মধ্যেই কেক অথবা ক্যারামেল কাস্টার্ড করে আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিতেন। বিকেলবেলা কখনও কখনও গল্পও করতে আসতেন। সহায়সম্বলহীন কিন্তু ভারি ভদ্র, সমাহিত, নির্লোভ, সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত মানুষ ছিলেন স্মিথ সাহেব। যে বাংলোর উনি কেয়ারটেকার ছিলেন তার হাতাতে কয়েকটি জ্যাকারান্ডা গাছ ছিল। ওই দু'বাড়ির পেছনেই ছিল বিস্তীর্ণ টাঁড় এবং খোয়াই, যা গিয়ে শেষ হয়েছিল একেবারে কানহারী পাহাড়ের পাদদেশে। পঞ্চাশের দশকের কথা বলছি। তখন মাঝে মাঝে কানহারী থেকে নেমে সন্ধের পরে চিতাবাঘও চলে আসত। রেড বা ইয়ালো ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ নিস্তব্ধ নির্জন বৃষ্টি-ভেজা টাঁড়ের ওপরে চমকে চমকে ডাকত 'ডিড য়্যু ড্যু ইট?' ডিড য়্যু ড্যু ইট? ডিড য়্যু ড্যু ইট?

এই পাখির ডাক পূর্বভারতে বিশেষ শোনা যায় না। কিন্তু রুখু অঞ্চলে এরা থাকেই। বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, এমনকি মহারাষ্ট্রেও এদের দেখা যায়। এদের প্রথম দেখি আমি স্কুলছাত্র থাকাকালীন

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের কাছে বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরসংলগ্ন মালভূমিতে এবং তাদের ডাক শুনে মুগ্ধ হই। তখন তাদের ইংরেজি নাম বা অর্নিথলজিকাল নামও জানতাম না। তাদের ডিড উ্য ড্যু ইট ডাকটি দূর থেকে টিটির-টি—টিটির-টি শোনাত। বাবার রাইফেল হাতে একদল চিঙ্কারা হরিণের (যে হরিণ এখন মারলে জেল হবে) পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো বিস্ময়াভিভূত এক কিশোরের কানে সেই পাখির চমক ভরা থমকে দেওয়া ডাক জাদুর স্পর্শ ছুঁইয়ে দিত। পরবর্তী জীবনে যত লেখা লিখেছি—সাম্প্রতিক অতীতের ছত্তিশগড়ের বেশকালঘাটির অভয়ারণ্যের পটভূমিতে লেখা 'সম'-এ পর্যন্ত এই পাখির ডাকের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। আমার মৃত্যুর সময়ও, যার হয়ত খুব দেরিও নেই, ওই পাখির ডাক দূরের টাঁড়ের ওপরে শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারলে বড় শান্তিতে যেতে পারব।

চমনলালের বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে বড় ছিল। ওর যখন ইচ্ছে হত ও কানে শুনত, ইচ্ছে না হলে শুনত না। ড্যাবা-ড্যাবা চোখে এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি ছিল। খিচুড়িটা খুবই ভাল রাঁধত। তখন ছাত্র, যে টাকা ট্যাঁকে করে বন্দুক কাঁধে রাতের ট্রেনে থার্ড ক্লাসে (তখন থার্ড ক্লাস ছিল) চড়ে পড়তাম হাজারিবাগে যাওয়ার জন্যে, তাতে দু'বেলা খিচুড়ি ছাড়া অন্য খাদ্য বিশেষ জুটত না। শিকার করলে মাংস খেতে পারতাম। মাছের মুখও দেখতাম না—রাগ করে নয়, সামর্থ্যের অভাবে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনও ঘাটতি ছিল না। যৌবন ঈশ্বরের সর্বোত্তম দান। যৌবন থাকলে আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সব সময়েই হাসি, গান, নির্জনতা উপভোগ করা—আনন্দই আনন্দ। প্রতিটি মুহূর্ত অপার আনন্দে কাটত।

গোপালের কথা সব বলতে গেলে একটি আলাদা বই লিখতে হয়। শুধু গোপালের কথাই নয়, এই বইয়ে উল্লিখিত সকলের কথাই। তবে 'জংলি-মহলের' অন্যান্য নানা চরিত্রর কথা বলতে গিয়ে গোপালের কথা আবারও নিশ্চয়ই আসবে। বিশেষ করে নাজিম সাহেব, ভুতো পার্টি, সুব্রত চ্যাটার্জি এদের কথা বলার সময়ে।

নাপিত মহাবীরও খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্র ছিল। ও আমাদের তেল মাখাতে মাখাতে এমন এমন সব গল্প বলত, যা মনে রাখার মতো। ওরই বলা ডাকাত

দিগা পাঁড়ের নামটিকে আমি মাধুকরীর সন্ত দিগা পাঁড়ে করেছি। মাধুকরীর অনেকই চরিত্রের বীজ হাজারিবাগ থেকে নেওয়া।

গোপাল এবং হাজারিবাগের স্মৃতির কথা বলতে গেলে সত্যিই আলাদা বই লিখতে হয়।

একবার আমরা দুজনে গেছি হাজারিবাগে। তখনও আমরা সি.এ.-র ছাত্র। তবে আর্টিকেলশিপ শেষ হয়েছে। যার-যার বাবার অফিসে কাজ করি এবং সামান্য মাইনে পাই।

একদিন বিকেলে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, পূর্বাচলের করম মালি নিজের কাজ থামিয়ে এসে বলল যে সীতাগড়া পাহাড়ে একটি মস্ত বড় বাঘ নাকি পাহাড়ের উপরের পিঁজরাপোলের গোরু-বলদ মেরে একসা করে দিচ্ছে। দুটি মানুষও নাকি মেরেছে ইতিমধ্যেই।

তখন আমাদের দুজনেরই শুধুমাত্র একটি করে দোনলা বন্দুক। রাইফেল নেই। জিপতো নেইই, গাড়িও নেই। টাকাও নেই যে জিপ বা গাড়ি ভাড়া করব। 'পূর্বাচল' থেকে 'সীতাগড়া' অনেকই দূর। অথচ বাঘ এবং এমনি বাঘ নয়, মানুষখেকো বাঘ মারার এমন সুযোগ আর আসবে না।

গোপাল বলল, গতকাল সকালে বাজার ফেরত নাজিম সাহেবের দোকানে গেছিলাম। তিনি বললেন যে হাজারিবাগের পুলিস সাহেবের বড় ছেলে আমাদেরই বয়সী এবং তারও শিকারের শখ আছে। পুলিস সাহেবের ছেলেকে কব্জা করতে পারলে আমাদের গাড়ি না থাকার দুঃখ ঘুচে যাবে। তুমি তো বাংলাটা ভাল লেখো—একখানা চিঠি লেখোতো ভাল করে যাতে এক চিঠিতেই সেই পার্টি কুপোকাত হয় আর সে কুপোকাত হলে তো কম্মো ফতেই হয়েই গেল। গোপাল আমার সঙ্গে ওই রকম ভাষাতেই কথা বলত।

অতএব পূর্বাচলের পশ্চিমমুখো বারান্দাতে বসে আমি সুব্রত চ্যাটার্জি নামক অদেখা অজানা এক সমবয়সী ছেলের উদ্দেশে একটি চিঠি মক্সো করে গোপালকে পড়ে শোনালাম। গোপাল বলল, এক্কেবারে অ্যালফাম্যাক্স-এর লেথাল বল এর মার হয়েছে। এ চিঠিতে পুলিস সাহেবের ছেলে ধরাশায়ী না হয়েই যায় না।

তারপর চিঠি খামবন্দি করে করম মালির হাত দিয়ে পাঠানো হল। করমের বাড়ি ছিল সিঁদুর বস্তিতে—কানহারী পাহাড়ের নীচের জঙ্গলের মধ্যের শর্টকার্ট লাল মাটির পথ দিয়েই সে তার গাঁয়ে ফিরত আর পুলিশ

সাহেব সত্যচরণ চ্যাটার্জির বাংলো ছিল কানহারী হিল রোডেরই উপরে। এস. পি. সাহেবের নাম, তাঁর বড় ছেলের নাম এসব নাজিম সাহেবই আমাদের দিয়েছিলেন। নাজিম সাহেবের সঙ্গে পুলিসের সম্পর্ক ছিল কারণ পুলিস দপ্তরেও উনি ইউনিফর্ম, জুতো, বেল্ট, টুপি এসব সরবরাহ করতেন। সুব্রতর নাম উনি লিখে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সুব্রত নামটি উনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। চিরদিন সুব্রতকে 'সুরবোতো' বলতেন। নয়তো, সুব্রতর মা, পরে আমাদের প্রিয় মাসিমা সুব্রতকে যে ডাকনামে ডাকতেন সেই 'খোকা' নামেই ভর করেছিলেন। বলতেন 'খোকাবাবু।'

করম তো চিঠি নিয়ে চলে গেল। সে কাজে আসবে আবার পরদিন সকালে। আমাদের টেনশন শুরু হল।

পরদিন করম যথাসময়ে কাজে এল আর জানাল যে পুলিশ সাহেবের বাংলার একজন গার্ড চিঠিটি নিয়ে বাংলোর ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে। চিঠি যে যথাস্থানে পৌঁছেছে তা নিয়ে কোনও সংশয়ের কারণ নেই। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। দুপর গড়িয়ে, বিকেল, তবুও কোনও উত্তর নেই।

আমি অনুযোগ করে গোপালকে বললাম, মিছিমিছি ছোট করা হল নিজেদের। মধ্যে দিয়ে সীতাগড়ার বাঘের খবরটা সে পেয়ে গেল। আমাদের কলা দেখিয়ে রিসোর্সফুল এস. পি. সাহেবের ব্যাটাই বাঘটা মেরে দেবে।

গোপাল হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, পার্কালাম্।

তখন তামিলনাড়ুর লুঙি-পরা গুঁফো নেতা কামরাজ নাদার প্রায়ই শব্দটি ব্যবহার করতেন। সব কাগজেই শব্দটি প্রকাশিত হত। তার মানে নাকি WAIT AND SEE।

তারপর গোপাল পরপর তিনবার বলল, পার্কলাম্। পার্কালাম্! পার্কালাম্!

আমি তখন পাইপ খেতাম। প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর খেয়েছিলাম। পাইপে ভাল করে তামাক ঠুসে আবার পাইপটা যখন ধরাচ্ছি একটি কালো-রঙা ঢাউস মার্কারি-ফোর্ড গাড়ি পূর্বাচলের গেট-এ এসে দাঁড়াল। করম দৌড়ে গিয়ে গেট খুলতে গাড়িটি ভিতরে এল। ড্রইভিং সিট থেকে একটি ফর্সা, বুদ্ধিমান, লম্বা এবং ছিপছিপে ছেলে নেমে হাতজোড় করে বলল, আমিই সুব্রত। আমরাও নমস্কার করে তাকে বসালাম। গোপাল

ভিতরে গিয়ে চমনলালকে চা আনতে বলল। এবং বিড়ি এগিয়ে দিল। দেখলাম আগন্তুকও গোপালেরই মতো প্রায় চেইন স্মোকার।

সুব্রত বাঘ সম্বন্ধে যা জানার তা জেনে নিয়ে বলল, কাল আমি বাবার সঙ্গে কোডারমা যাচ্ছি—বাবা কোডারমা থানা ইনসপেকশানে যাচ্ছেন। পরশুর পর দিন আমি ফিরে আবার যোগাযোগ করব। তারপরই বলল, আপনারা কদিন আছেন?

অফিসে আমার জরুরি কাজ ছিল। আমি বললাম, আমি তিনদিন আছি তবে গোপাল থাকবে আরও কদিন।

সুব্রত বলল, হুম্‌ম্‌।

এই রকম হুম্‌ম্‌ বলা ওর অভ্যেস ছিল।

তারপর চা-টা খেয়ে আমাদের স্বার্থ পুরোপুরি অসিদ্ধ রেখে 'আজ তাহলে চলি' বলে সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনারাও আসবেন একদিন। আমরাও ওকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে নমস্কার করলাম।

গোপাল বলল, পার্টি চালিয়াত আছে। এই টুকু তো পথ, হেঁটে আসতে পারল না, নিদেনপক্ষে সাইকেল? বাবার গাড়ি তো আমাদেরও অনেকই আছে। বাবার গাড়ি দেখিয়ে আমাদের ইমপ্রেস করতে এসেছিল। ফুঃ।

সুব্রতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পরে বুঝেছিলাম যে ও চালিয়াত নয় তবে ওর নিজস্ব স্টাইল ছিল সব ব্যাপারেই। ভীষণই বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং মিতভাষী ছিল ও। রসবোধও ছিল প্রচণ্ড। পরবর্তী জীবনে 'থ্রি-কমরেডস' এর মতো হয়েছিল আমাদের বন্ধুত্ব, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অঢেল অমিল থাকা সত্ত্বেও।

ও চলে গেলে, গোপাল স্বগতোক্তি করল, আগামীকাল ভুতো পার্টির আসবার কথা আছে কলকাতা থেকে। ওর বন্ধু তুতুল, তার সেকেন্ড হ্যান্ড সিঁত্রয় গাড়ি আর নতুন দোনলা বন্ধুক নিয়ে আসবে।

খবর শুনেই আমি কুঁকড়ে গেলাম। গোপালের সঙ্গে আমার ওয়েভ-লেংথ-এর মিল হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু আড্ডা টাড্ডা খুব একটা মারতাম না—অন্য ওয়েভ-লেন্থ্-এর মানুষের সঙ্গে চট করে মিশতে পারতাম না। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমার পছন্দ অপছন্দ অত্যন্তই তীব্র ছিল। যাকে বা যাদের আমি পছন্দ করি তাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারি

আর যাদের করি না তাদের সহ্যই করতে পারি না। হয়তো তাদের প্রাণও নিতে পারি। এটা অত্যন্তই দোষের কথা। নীরেনদা (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) পরবর্তী জীবনে আমাকে বলেছিলেন, যেখানে প্রেমের সম্পর্ক সম্ভব নয়, সেখানে প্রীতির সম্পর্কও রাখতে পারবে না কেন?

তেমন করে নীরেনদার কথা মানা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। এই অপারগতার জন্যে মূল্যও কম দিতে হয়নি।

সেই কারণেই, কারা আসবে না আসবে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

ভুতো পার্টি কে? কী করে?

ভুতো আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। তবে আলাপ হলে জানতে পাবে সে কী যন্ত্র অথবা যন্ত্রণা!

জিজ্ঞেস করলাম করেটা কী? ইংরেজিতে যেমন বলে, হোয়াট ইজ হি?

ওর একটা ছোট মোটর গারাজ আছে—মানে মেরামতির গারাজ। আমাদের গাড়িও মেরামত করে। স্কুলের গণ্ডিও পেরোয়নি, কেন পেরোয়নি সে এক ইতিহাস। তবে প্রচণ্ড ইন্টেলিজেন্ট এবং ভেরি গুড কোম্পানি।

আমি চুপ করে রইলাম। গাড়ির মিস্ত্রী!

গোপালের মধ্যে এই ব্যাপারটা ছিল। ও নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষদের এড়িয়ে চলত আর অনেক ক্ষেত্রেই দোস্তি করত ওর চেয়ে সবদিক দিয়েই নিকৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে। পরে বয়স বাড়লে অভিজ্ঞতা বাড়লে বুঝে ছিলাম কোনও ব্যাপারেই শ্রেণিভেদ করলে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কম শিক্ষিত, কম বিত্তশালী, কম সামাজিক পরিচয়ের মানুষেরাই উচ্চশিক্ষিত, প্রভূত বিত্তশালী এবং সমাজের উচ্চতম সোপানে আবস্থানকারী মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি নিটোল মানুষ, অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং। 'মাধুকরী'র পৃথু ঘোষের গড়নে গোপালের প্রভাব অবশ্যই ছিল এবং মোটর মেকানিক ভুচুর মধ্যে পরে আমাদের অত্যন্তই পরিচিত ভুতোর প্রভাবও ছিল কিছুটা। উপন্যাসের কোনও চরিত্রই হুবহু একজন অন্য মানুষের মতো হয় না। তা হলে উপন্যাসের চরিত্রহানি হয়। তবে অন্য এক বা একাধিক মানুষের ছায়া উপন্যাসের নায়ক নায়িকার উপরে পড়েই।

সারা রাত বৃষ্টি হয়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়েছিল। চোখ মেলেই দেখি বারান্দায় তিন-চারটি ছেলে। নিম্নাঙ্গে ফেডেড জিন্‌স এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। প্রত্যেকেরই বুকে চুলের কম্বল।

'জিন্‌স' এখন সকলেই পরে। পঞ্চাশের দশকের শেষে জিন্‌স খুব কম মানুষই পরতেন। মেয়েদের মধ্যে জিন্‌স পরার চল তো একেবারেই ছিল না। ঘুম থেকে উঠেই একটা ধাক্কা খেলাম। চোখমুখ ধুয়ে বারান্দাতে চা-এর টেবলে গিয়ে বসার পরে গোপাল সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

তুতুল নামের ছেলেটি বলল, নতুন বন্দুকের লাইসেন্স করেছি তাই হাজারিবাঘে এলাম। যেখানে হাজার বাঘ আছে, সেখানে কি আমার জন্যে একজনও আত্মহত্যা করতে রাজি হবে না?

কী কী শিকার করেছেন?

ভুতো বলল, বকও মারেনি। বাঘ দিয়ে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে চায়।

গোপাল বলল শব্দটা হাজারিবাঘ নয়, হাজারিবাগ—মানে যেখানে হাজার বাগিচা।

তাই?

তুতুল বলল লজ্জিত হয়ে। ওরা থাকত দেশপ্রিয় পার্কের গায়ের লেক টেরাসে। ওর কাকা জজসাহেব ছিলেন। বহু বছর হল আমেরিকাতে থাকে। মাঝে মাঝে এয়ারপোর্টে দেখা হত।

চা খাওয়ার পরে গোপাল আমাকে ডেকে নিয়ে পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বলল, লালসাহেব, বন্দুক দুটো ভেঙে বাজারের বড় থলেতে ঢুকিয়ে রিকশা করে আমরা সীতাগড়া পাহাড়ের নিচু অবধি যাব। নাজিম মিঞাও যাবেন অন্য রিকশাতে। উনি আমাদের জন্যে কাছারির মোড়ে অপেক্ষা করবেন। এস. পি.র ছেলে বাঘটা মারার আগেই আমাদের একটা চেষ্টা করতে হবে। আর এই পার্টিদের গাড়ি থাকলেও গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে না আমাদের। কী কেলো হল বলো তো!

ব্রেকফাস্টের পরে 'বাজারে যাচ্ছি' বলে আমরা তো ডি. ভি. সি.র মোড় থেকে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সীতাগড়াতে পৌঁছতে অনেকক্ষণ লাগল। সেখানে রিকশাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ওয়েটিং চার্জ দেবার লোভ দেখিয়ে নিজের নিজের বন্দুক জোড়া লাগিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলাম।

বাঘ মারা খুব সহজ কর্ম নয়—আসলে আমরা সেই সকালে গেছিলাম স্কাউটিং করতেই।

ঈশ্বর বড় দয়ালু। আধ মাইলটাক গিয়েই পথের ডান দিকে একটি নালার মধ্যে বাঘের থাবার দাগ আবিষ্কার করলেন নাজিম সাহেব। গত রাতের বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে ছিল সেই মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ দেখে আমাদের পিলে চমকে গেল। এত বড় বাঘ! বাঘের না, যেন হাতির পায়ের দাগ। শোনা গেল বাঘ এই নালা দিয়েই জঙ্গলের ভিতর থেকে এসে পথে ওঠে। এরপর রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের জঙ্গলে যায়। সে জঙ্গলেই পিঁজরাপোল-এর গাই বলদ চরা বরা করে। রাস্তার ও-পাড়ে একটি বড় আমগাছ দেখিয়ে নাজিম সাহেব বললেন, ওই গাছে মাচা বেঁধে আজই বিকেলে এসে বসতে হবে। কপালে থাকলে এস. পি. সাহেবের ছেলে মারার আগে আমরাই বাঘ মেরে দেব। তবে একটা কাঁড়া জোগাড় করতে হবে। সেটা বেঁধে মাচায় বসতে হবে।

নালা থেকে উঠে আমরা কাঁচা পথে সবে উঠেছি এমন সময়ে দেখি সিঁত্রয় গাড়িটি আসছে। কাছে আসতেই গাড়ি থামিয়ে 'হাজারিবাঘে' বাঘ মারতে-আসা শিকারিরা নেমে পড়ে আমাদের মারে আর কী! গোপালেরই গালাগালিটা শুনতে হল বেশি। ওরা বলল "হাউ মিন অফ উ্য"। এই ভাবে আমাদের সঙ্গে মিথ্যাচার করে একা একা বাঘ মারতে চলে এলেন আপনারা।

কে বলল তোমাদের?

কে আবার? চমনলাল। তাকে অবশ্য একটা বড় পাত্তি দিতে হয়েছিল। তবু কিছুতেই কবুল করে না। শেষে গুলি করার ভয় দেখিয়ে ফ্যাক্টটা জানা গেল।

গোপাল বলল বলল, আমরা স্কাউটিং করতে এসেছি। তোমরা গিয়ে সীতাগড়া গ্রামের মুখিয়ার কাছে বোসো। আমরা আসছি।

তারপরের ঘটনা আমরা মুখিয়ার মুখেই শুনি। আম গাছটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে মুখিয়ার কাছে একটি কাঁড়া অর্থাৎ মোষের কথা বলে এবং গাছটার বর্ণনা দিয়ে সেখানে একটা মাচা বাঁধতে বলে আসবেন নাজিম সাহেব—টাকা-পয়সাও দিয়ে দেবেন। কাঁড়া যদি বাঘের হাতে মারা যায় তবে তার দাম দিয়ে দেওয়া হবে আর বেঁচে থাকলে মোষের ভাড়া বাবদও কিছু টাকা দেওয়া হবে। নাজিম সাহেব মুখিয়াকে ভাল করে জানতেন।

আমরা যখন সীতাগড়া গ্রামের কাছে পৌঁছেছি তখন দেখি সিঁত্রয় গাড়িটা ফিরে আসছে। কী হল? ফিরে আসছে কেন?

গাড়িটা কাছে আসতেই ওরা বলল, সারা রাত ড্রাইভ করে এসেছি, ঘুম পাচ্ছে। আমরা ফিরে যাচ্ছি। গিয়ে চান করে ভাত খেয়ে ঘুমুব।

মুখিয়ার মুখ থেকেই ওদের ফিরে যাওয়ার কারণ জানা গেল।

ওরা গ্রামের বড় অশত্থগাছের তলাতে গিয়ে পৌঁছতেই মুখিয়া তাদের চৌপাই পেতে বসতে দিয়ে জল আর গুড় খেতে দিয়েছিল। জল খেয়ে তুতুল বলল, আরে এ বুঢ্ঢা, বাঘ হ্যায় হিঁয়া? বাঘ দিখা দো, বাঘ মারে গা।

মুখিয়া তার বুকের কাছে ডান হাতখানা তুলে বলল, বাঘোয়াতো হ্যায়ই হুজৌর মগর ডাবল বাঘোয়া। দিখকর আপলোগোঁকা দিমাগ খরাব হো যায়েগা। বাঘোয়া মারা আপনে কভি?

বহুত মারা। সুন্দরবনকে কিতনা বাঘোয়া মারা!

মুখিয়া বলল, তবতো ঠিক্কেই হ্যায়। বাঘোয়া দিখা দেগা। মগর ইক বাত পুছনা থা।

ক্যা বাত?

আপলোগোঁকি কন্টিপেটাং হ্যায় ক্যা?

কন্টিপেটাং? মৎলব?

তব শুনিয়ে, বাতাতা হ্যায়। কলকাত্তাসে চুনী বাবু আয়া থা বাঘোয়া শিকারকি লিয়ে। মাচ্চা বান্ধা গ্যায়া, খানা-পিনা, নাচনা-গানা, ফালানা—চোমকানা। ম্যায় ঔর চুনীবাবু মাচান পর বৈঠে হুয়ে থে। সুরজ ডুবা নেই উসকি পহিলেই বহুত বড়কা বাঘোয়া আ পৌঁছা মাচানকি নীচে। কাঁড়াতো ডরকে মারে ধড়ফরানে লাগা। চুনী বাবুকো ডাইনে রাইফেলোয়া, বাঁয়া বন্দুকোয়া। ম্যায়নে বোলিন, মারিয়ে চুনীবাবু, মারিয়ে। বাঘোয়া খাড়া হ্যায়।

বাঘোয়া তো ইস্মে-উস্মে গামাতা হ্যায়। মগর চুনীবাবু না বন্দুক উঠাইস্ না রাইফেলোয়া।

ম্যায়নে বোলা, মারিয়ে চুনীবাবু, মারিয়ে। ওহি টাইম পর—ক্যা বোলিন বাবু—যেই সা আওয়াজ ঐসা বদবু। আওয়াজ না শুনকর বাঘোয়া তো কুদকর ভাগ গ্যায়া। ওর ম্যায়নে গিড়া বহতই মুসীবতমে—উপরমে চুনীবাবু

নিচুমে বাঘোয়া—ক্যা করে ম্যায়, ছুঁওড়াপুত্তানিয়া। ম্যায়তো তুরন্ত মাচানকে নীচে উতরা ঔর অংগলি সে নাক বন্ধ করকে বোলা আপনে ক্যা কিহিন চুনীবাবু। চুনীবাবু বোলিন, চুপ রহো, সুরতহারাম। জলদি তানবুমে যাও, পায়জামা লাও। হামারা কন্টিপেটাং থা। তিন মাহিনাসে কিলিয়াড় নেহি হোতা যা। বাঘোয়া দিখকর ....।

গল্প শুনে ভুতো অ্যান্ড তুতুল কোম্পানি তো হতভম্ব।

ভুতো বলেছিল, মানে বুঝলি তুতুল?

তুতুল বলল, হ্যাঁ। কনস্টিপেশান।

মুখিয়া বলল, আপলোগোঁকো কন্টিপেটাং নেহি রহনেসে ম্যায় বাঘোয়া দিখা দেগা। বোলিয়ে, হ্যায় ক্যা নেহি?

হাইলি ইনটেলিজেন্ট ভুতো ও তুতুল সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে গাড়ি ঘুরিয়ে হাজারিবাগ শহরের দিকে 'অ্যাবাউট-টার্ন। সেই সময়েই তাদের সঙ্গে দেখা আমাদের।

গল্প শুনে আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। নাজিম সাহেব হো হো করে হাসতে লাগলেন। ঘটনার ঘোর কাটিয়ে ওঠার পরে আমরাও।

সে দিন সীতাগড়াতে আমাদের আর ফেরা হয়নি। কারণ, গোপালের একটি দুরারোগ্য রোগ ছিল। হাজারিবাগে থাকাকালীন সে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একগাছা বিড়ি খেয়ে পায়জামার দড়িটি ঢিলে দিয়ে নেয়ারের চৌপায়াতে শুয়ে পড়ত। ওর হাতে পায়ে ধরলাম সেদিন না-ঘুমোনোর জন্যে। আমরা সীতাগড়া থেকে ফিরেই ছিলাম প্রায় দেড়টার সময়ে। গোপালের ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য অস্ত গেছে। তখন আর নাজিম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সীতাগড়াতে গিয়ে মাচা বাঁধিয়ে এবং মাচার নীচে মোষ বেঁধে বসার সময় ছিল না। তবে, গেছিলাম পরদিন। কিন্তু সেদিনও গেছিলাম গোপালের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পরে। ফলে মাচা বাঁধানো গেলেও মোষ বাঁধার সময় ছিল না। সীতাগড়ার মুখিয়া আগের দিন সব জোগাড়যন্ত্র করে রেখেছিল কিন্তু আমরা না-যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে পরদিন কাঁড়া আর জোগাড় করেনি। তবে অদম্য এবং জিনিয়াস নাজিম সাহেব এক গাছা গোরু বাঁধা দড়ি ও গোরুর গলার ঘণ্টা জোগাড় করে দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা ঘণ্টাটিকে মাচা থেকে অনেক দূরে একটি ঝোপের মধ্যে শক্ত করে কিন্তু ঢিলে দিয়ে বেঁধে

দড়ির অন্য প্রান্ত হাতে করে মাচাতে বসলেন এবং অন্ধকার হয়ে যাবার পর থেকেই মাঝে মাঝেই দড়িটিতে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘণ্টাটাকে বাজাতে লাগলেন। শব্দ শুনে শুনে আমাদেরও মনে হতে লাগল যেন কোনও গোরু ঘরে ফেরেনি জঙ্গল আর টাঁড়ের মধ্যের কেলাউন্দা ঝোপের কাছেই চরা-বরা করছে। আমাদের মনে হলে বাঘেরও মনে হতে পারত। এবং বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাইই মনে হয়েছিল সেই বাঘেরও।

যে গাছে ঘণ্টা বাঁধা ছিল তার বেশ খানিকটা পেছনে একটি বড় কালো পাথর ছিল—কাছিম পেঠা। তার উপরে এসে বাঘটি বসে ছিল। পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলোতে কালো পাথরের উপরে হাজারিবাগে বাঘের পাটকিলে রঙা শরীরের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু তার অবস্থান ছিল বন্দুকের পাল্লার অনেকই বাইরে। নাজিম সাহেবের, গোপালের এবং আমার তিনজনেরই কাছে দোনলা বন্দুক ছিল বারো বোরের কিন্তু তিনটি বন্দুক থাকলেও বন্দুকের পাল্লা তো আর ত্রিগুণান্বিত হয়ে যায় না।

ইতিমধ্যে ভুতো অ্যান্ড তুতুল পার্টির সঙ্গে আমাদের শান্তি চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। 'কন্টিপেটাং না থাকলেও এ বাঘ মারার আর কোনও উৎসাহ তারা দেখায়নি বরং তাদের গাড়ি করে আমাদের অকুস্থলে পৌঁছে দিয়ে হাজারিবাগে ফিরে গিয়েছিল। কথা ছিল যে তারা রাত দশটা নাগাদ ওই গাছতলাতে ফিরে আসবে আমাদের ফেরত নিয়ে যেতে। তবে তাদের বারবার করে বলে দিয়েছিল গোপাল তারা যেন গাড়ি থেকে না নামে এবং হেডলাইট জ্বালিয়ে যেন গাড়ি গাছতলাতে দাঁড় করিয়ে রাখে।

বাঘ কোনও বুড়ো ঋষির মতো সেই পাথরে বসে রইল তো বসেই রইল। ভুলেও সে মাচার দিকে এল না। গতকাল সকালে আমরা তার পায়ের থাবার দাগ দেখেছিলাম। আমাদের কারওরই সাহস ছিল না ওই বাঘকে রাতের বেলা পায়ে হেঁটে গিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি করি। অভিজ্ঞ নাজিম সাহেবেরও সেই দুঃসাহস ছিল না। কলকাতার শিকারি চুনীবাবুর একারই নয়, প্রায় অধিকাংশ বাঘ-প্রত্যাশী শিকারিরই বোধ হয় সুপ্ত কন্টিপেটাং থাকে। সময় বিশেষে তা ধরা পড়ে, এটাই যা।

রাত দশটাতে সিঁত্রয় গাড়ি এল এবং দুজন টিন এজার এবং অনভিজ্ঞ শিকারি তাদের লোকাল গার্জেন নাজিম সাহেবের সঙ্গে মাচা থেকে নেমে

কিছুটা হেঁটে গিয়ে সিঁত্রয় গাড়ির কাচ-বন্ধ নিরাপত্তাতে ফিরে আশ্বস্ত বোধ করেছিল সেই ফিস ফিস করে বৃষ্টিঝরা রাতে।

আমি পরদিন ফিরে যাব কলকাতাতে। গোপাল ফিরবে তিনদিন পরে। গোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, খাল কেটে কুমির আনলাম আমরা। এ বাঘ পুলিশ সাহেবের ছেলের অ্যাকাউন্টেই জমা পড়ল। বুঝলে, লালসাহেব।

আমি বললাম হুঁ।

গোপাল একবার হাজারিবাগে গেছে গরমের সময়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে। ও ড্রাইভার রাখেনি কখনও। বলত, 'প্রাইভেসি থাকে না।' সেখানে গিয়ে তার পুত্র গুটুগুটবাবু ও একমাত্র বোনের ছেলেকে নিয়ে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল ছোঁড়া প্র্যাকটিস করাচ্ছিল পেছনের বাগানের খড়-ছাওয়া ঘরের সিমেন্টের বেঞ্চে বসে। গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল রীতিমতো প্রতিযোগিতার কার্ড-এ। কার্ড-এর মধ্যে 'বুলস আই', তার পরের বৃত্তটির নাম 'ইনার', তার পরে 'ম্যাগপাই', তার পরে 'আউটার'। কার কটা গুলি বুলস-আইতে লাগছিল তাই দেখা হচ্ছিল। যাদের হাত খুব ভাল তাঁরা বুলস-আইয়ের একই ছ্যাঁদা দিয়ে একাধিক গুলি ঢোকাতে পারে। তাতে সেই ছ্যাঁদাটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায়। আমার বাবা, রাঁচির 'Gonda House'-এ, এখন যেখানে কোল ইন্ডিয়ার অফিস, তখন আমাদের মক্কেল, কলিয়ারি-কিং অর্জুন আগরওয়ালার বাড়ি ছিল (তৎকালীন সাহেব গভর্নরের শ্বাশুড়ির বাড়ি, তাঁরা বিলেত চলে যাওয়ার সময়ে অর্জুনবাবু কিনে নিয়েছিলেন) সেই বাড়ির পেছনে ১২০ বিঘা হাতার মধ্যে একটি পাহাড় ছিল। সেখানে শুটিং রেঞ্জ ছিল। সেই শুটিং রেঞ্জের সামনে ফোটা গ্যাঁদা ফুলের পাপড়িগুলোকে বাবাকে গুলি করে একটি একটি করে ছিঁড়তে দেখেছি আমি—পয়েন্ট টু-টু রাইফেল দিয়ে। তখন দারুণ হাত ছিল বাবার।

গোপালের প্র্যাকটিস যখন জমে উঠেছে তখন হঠাৎ ওর ডান চোখের মণিটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। গোপাল বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে সেই অবাধ্য মণিকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে ছেলে ও ভাগ্নেকে বলল, প্যাক-আপ। কলকাতা যেতে হবে। ততক্ষণে রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে।

ভাগ্নেকে বলল, সিগারেটটা ধরিয়ে দে তো বিটকেল। আদরের ভাগ্নেকে

সে বিটকেল বলে ডাকত। তারপর চমনলাল গাড়িতে মালপত্র চাপালে, ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা চলে এল। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। তার কিছুদিন আগেই ওর একই সঙ্গে সেরিব্রাল ও করোনারি স্ট্রোক হয়েছিল, অফিসে বসে কাজ করতে করতে।

অফিসের কাজে সে অবশ্য কখনও তেমন মন দেয়নি। ওর মন পড়ে থাকত হাজারিবাগে। এদিকে মন দেওয়ার দরকারও ছিল না। ওরা এমনিতেই এত ধনী ছিল যে কয়েক পুরুষ অনায়াসে বসে খেতে পারত। ওর ভালবাসার জায়গা ছিল হাজারিবাগ। কোনও নারীকেও সে জীবনে এত ভালবাসেনি। আর ভালবাসার জিনিস বলতে ছিল বন্দুক-রাইফেল, পারফিউম, নানা রকম ক্যামেরা, নানা রকম ওরিজিনাল জামাকাপড়। কোনও ক্লাবেরই মেম্বার ছিল না—। আমি কলকাতায় প্রায় সবকটি ক্লাবের মেম্বার ছিলাম এক সময়ে, কিন্তু ওকে কোনও দিনও কোনও ক্লাবেই নিয়ে যেতে পারিনি। ও বলত, দুসস্, মেকি পরিবেশ।

হাজারিবাগে, গরমের সময়ে, আমরা একবার রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্কে আছি। তখন আমি, গোপাল এবং আমাদের আরেক বন্ধু সুব্রত, সবাই প্রতিষ্ঠিত। সকালবেলাতে একটি ছোট ঝোলাতে দুটি বিয়ারের বোতল এবং সাইলেন্সার-লাগানো পিস্তলটি নিয়ে শর্টস এবং স্পোর্টস গেঞ্জি পরে টুকটুক করে হেঁটে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেত গোপাল। দু-তিন ঘণ্টা পরে ফিরত ঝোলার মধ্যে একটি মোরগ বা দুটি তিতির নিয়ে। সাইলেন্সার-লাগানো পিস্তল দিয়ে মারাতে কোনও শব্দ হত না।

ব্যাপারটা পুরোপুরিই বেআইনি ছিল। কিন্তু গোপালের মধ্যে রাজা মহারাজা নবাবদের মতো এক ধরনের রহিসি ছিল বলেই হয়ত কোনও রকম আইন-কানুনেরই ও তোয়াক্কা রাখত না। তাচ্ছিল্যের গলাতে বলত, 'ছাড়ো তো লালা। আমি দুগাছা তিতির মারলেই দেশের সব্বোনাশ হবে? দেশে যে সব মহাচোর ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিনদুপুরে ডাকাতি করছে, সেই সব শিল্পপতি আর নেতাদের পোরো না দেখি জেলে! যত্ত সব আদিখ্যেতা!'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমনভাবে বলতেন, 'যত্ত সব ফোতো'—গোপালের 'যত্ত সব আদিখ্যেতা' বলার ধরনটাও ছিল তেমনই। তবে এ কথা ঠিক যে, তখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন হয়নি। তা

ছাড়া সব প্রাণীই ছিল অঢেল। কিন্তু অভয়ারণ্যের মধ্যে শিকার করা তো বেআইনি ছিলই।

আমি জরুরি কাজে দিল্লি গেছি। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাজ। রাতে হোটেল থেকে কলকাতাতে ঋতুকে ফোন করে জানলাম, গোপাল খুবই অসুস্থ হয়ে বেলভিউতে ভর্তি হয়েছে। আমি বললাম, পরশু সকালের ফ্লাইটে ফিরছি, ফিরেই নার্সিংহোমে যাব। তার আগে ফিরতে পারব না।

কলকাতায় ফিরে সকালে দেখা হল না। দেরি হয়ে গেছিল। গোপাল আই সি ইউ-তে ছিল। বিকেলে গেলাম। গোপালের স্ত্রী জয়শ্রীর খুবই আপত্তি, আমরা বন্ধুরা কেউই দেখা করি। কারণ, করলে ও উত্তেজিত হবে। হয়ত সত্যিই হবে। কিন্তু দেখা না করেই বা কী করি? ১৯৫২ থেকে বন্ধুত্ব। তা ছাড়া, জঙ্গলের বন্ধুত্ব। শহরে একশো বছরেও যে বন্ধুত্ব হয় না, পাশাপাশি রাইফেল বা বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে হাজারো বিপদের মুখে হেঁটে গেলে পাঁচ বছরেই সেই বন্ধুত্ব হয়। সেই বন্ধুত্বে যে 'জান কবুল' করতে হয়।

বিকেলে জয়শ্রীর কাছ থেকে প্রায় জোর করেই পাসটি নিয়ে গেলাম আই সি ইউ-তে। দেখি গোপালের চোখ বন্ধ। নানা নল ও ছুঁচে শরীর ভর্তি। আমি ওর মাথার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদুস্বরে ডাকলাম, 'গোপাল'। গোপাল যেন অন্ধকারের দিশেহারা নাবিক, লাইট-হাউস দেখেছে, এমন করে চাইল একবার। তারপরই ওর মুখের ওপরে আমার ঝুঁকে পড়া মুখ দেখেই দু-চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল ওর। কথা বলার শক্তি ছিল না কোনও।

আমি বললাম, তাড়াতাড়ি ভাল হও, আমরা আবার হাজারিবাগে যাব, বিরিয়ানি আর বটি-কাবাব খাব, কুসুমভা গ্রামে গিয়ে। আবার শিকার করব—চাতরা, সীমারিয়া, টুটিলাওয়া, টাটিঝারিয়া, সীতাগড়া সব জায়গাতেই যাব। আমি, তুমি, সুব্রত, ভুতো পার্টি সকলে মিলে।

তারপরই আমার চোখও জলে ভেসে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম ওর কপালে হাত ছুঁইয়ে। তার পরদিন গোপাল চলে গেল। আজ ১৭-১৮ বছর হতে চলল।

ওদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের পৈতৃক বাড়ি থেকে যখন বেলা এগারোটা নাগাদ শবযাত্রা বেরল, সকলে বলল, লালাদা, আপনার শরীর

ভাল না (বুকের একটু সমস্যা ছিল, তার কিছুদিন পরই অঞ্জিওপ্লাস্টিও করতে হয়েছিল) আপনি হেঁটে যাবেন না—এতগুলো গাড়ি রয়েছে, আপনার গাড়িও রয়েছে—গাড়িতে যান।

গোপালকে তার শিকারের, পেশার, রাইফেল ক্লাবের অগণিত বন্ধু শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল। মনে পড়ে গেল, আমি আর গোপাল ১৯৪৭-এ সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের সভ্য হয়েছিলাম এবং পয়েন্ট টু-টু রাইফেল ছুঁড়তাম। ক্যাপটেন বি. টি. ঠাকুর তখন ওই ক্লাব চালাতেন। আমরা দুজনেই তখন ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়তাম।

গোপালকে কাচ ঢাকা গাড়িতে না নিয়ে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত করেছিল বন্ধুবান্ধবরা। আমি বললাম, যৌবনের সেই সব প্রমত্ত সময়ে দিনে-রাতে আমরা পাশাপাশি দুজনে বন্দুক কাঁধে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটেই ঘুরেছি। আমার শরীর যতই খারাপ হোক না কেন, আমি হেঁটেই যাব, খালি পায়ে, এবং কাঁধও দেব মাঝে মাঝে।

মির্জা ঘালিবের সেই বিখ্যাত শায়রীটি আছে না?

'গুস্তাকি ম্যায় স্রিফ করেঙ্গে ইকবার
যব সব পায়দল চলেঙ্গে, ম্যায় কান্ধেপর সওয়ার।'

অর্থাৎ, জীবনে বেয়াদবি আমি একবারই করব। যখন সকলে আমার শবদেহ বয়ে নিয়ে হেঁটে যাবে আর আমি সকলের কাঁধে চড়ে যাব।

না, গোপাল কোনও গুস্তাকি করেনি। তার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল আমাদের কাঁধে চড়ে যাওয়ার।

প্রসঙ্গত বলি, আমার দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ 'বনবাসর'-এর উৎসর্গে আমি লিখেছিলাম :

'টিটি পাখি,
গেরুয়া মাটি,
কুসুমভার নিমগাছটি,
টুটিলাওয়ার চাঁদ,
টাটিঝারিয়ার চা,
এবং হাজারিবাগের গোপাল সেনকে।'

সুব্রত অথবা 'সুরবোতো' অথবা 'খোকাবাবু'

আমাদের বড় সাধের বাঘ সত্যি সত্যিই সুব্রতর অ্যাকাউন্টেই জমা পড়েছিল দিন পনেরোর মধ্যে। সে গল্প আনন্দ পাবলিশার্স-এর 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে' প্রথম পর্বে সবিস্তারে আছে। তাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে গোপাল কলকাতায় চলে আসার আগের দিন নাজিম সাহেব, গোপাল সেন এবং সুব্রত চ্যাটার্জি ওই আমগাছেই মাচা বেঁধে এবং নীচে কাঁড়া বেঁধে বসেছিল এবং বাঘ অন্ধকার হবার পরে পরেই এসে ওরা কিছু বোঝার আগেই কাঁড়াকে পটকে দিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে এবং ঘাড় মটকে যখন মনোযোগ সহকারে খেতে শুরু করেছে, নাজিম সাহেবের ফোকাস করা টর্চের আলোতে গোপাল বাঘের বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি করে 'রোটাক্স বল দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওর বুলেটটি আমগাছের একটি পাতলা ডালে ছুঁয়ে যাওয়াতে লক্ষ্যচ্যুত হয়। শিকারি মাত্রই জানেন যে এমন হতেই পারে, বিশেষ করে রাতের বেলা।

গোপালের হাত খুব ভাল ছিল কিন্তু বিগ-গেম্স এ যে টেম্পারমেন্টের দরকার হয় তাতে তার ঘাটতি ছিল। জীবনের অন্য সব ব্যাপারে এবং পাখি শিকারের বেলাতেও যে অতি ধীর স্থির সেই বিগ–গেম্স-এর বেলাতে দেখেছি চিরদিন নাজিম সাহেবের ভাষাতে যাকে বলে "হড়বড়িয়া-খড়খড়িয়া" ছিল। তবে গুলি ডিফ্লেক্টেড হয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্যর ব্যাপার। তাতে গোপালের কোন দোষ ছিল না।

গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অত বড় জানোয়ার, সে এল, কাঁড়াটার ঘাড় মটকালো, তাকে খেতে লাগল, আর খাওয়ার শব্দ ছাড়া কোনওরকম শব্দই শোনা গেল না। সত্যিই কোনওরকম শব্দই নয়।

বাঘের সঙ্গে যারা কখনও লেনাদেনা করেছেন তাঁরাই এ কথা বলেন। বড় বাঘের হরকৎই আলাদা। আমরা তখন ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞতার পরিমাণের চেয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিমাণ অনেকই বেশি। পরবর্তী জীবনে অনেক বাঘের মোকাবিলা করে একটু একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি যদিও তবু বাঘ এমনই এক জানোয়ার যে সে দুর্জ্ঞেয়ই রয়ে গেছে, ঈশ্বরেরই মতো।

সুব্রতর বাবা সীতাগড়ার আনাচে-কানাচে পুলিস দিয়ে খবর পাঠিয়ে ছিলেন যে যেখানেই বাঘ "কিল" করবে তা কাঁড়া-ভইষই হোক, কী মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সাহেবের বাংলোতে যেন খবর পৌঁছয়। খবর দিলেই হাতে হাতে গরমাগরম পাঁচ টাকা ইনাম মিলবে। তখন পাঁচ টাকার দাম ছিল। জঙ্গল পাহাড়ের গরিব মানুষদের কাছে তো ছিলই।

প্রত্যাশা পুরণ হল। কিল হবার খবর পেয়ে সুব্রত টুটিলাওয়ার জমিদার ভাল শিকারি ইজাহার হককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল বাঘ গোরুটাকে একটা নালার পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছুটা খেয়ে ফেলে রেখে গেছে একটা সাদা বড় বাছুরকে। ওরা বিকেল বিকেল এসে বসল কাছাকাছি মাচা বেঁধে। মাচাটা বাঁধা হয়েছিল একটি 'রিকেটি' শাল গাছে। কাছাকাছি কোন বড় এবং শক্ত গাছ ছিল না।

সুব্রতর বক্তব্য অনুযায়ী একটা পেল্লায় হলুদ-রঙা রামছাগল এসে বিদায়ী সূর্যের কনে-দেখা আলোতে তার গম্ভীর এবং ভয়াবহ মুখটি দেখাল এক ঝলক এবং মুখটি দেখা মাত্র সুব্রত মেসোমশায়ের পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ অ্যামেরিকান উইনচেস্টার আন্ডারলিভার রাইফেল দিয়ে গুলি করল। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কয়েক মিনিট পরে ভাল বাংলাতে যাকে বলে "প্রলয় উপস্থিত হইল" তাই হল। বাঘটা হাড়-কাঁপানো গর্জন করতে করতে তাদের মাচার দিকে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। একবার বাঘের ওই ভারী শরীরের ধাক্কাতে মাচাটা সজোরে দুলেও উঠল—ওদের মধ্যে একজন অথবা দুজনই পড়েও যেতে পারত নীচে। বাঘ যত গর্জন করে আর লাফায় ওরাও তত গুলি করে বাপ্‌ বেটার মতোই প্রায় "সুব্রত মারিস ইজাহার মারিস, ইজাহার মারিস—সুব্রত মারিস" এই ভাবে।

যতক্ষণ না দুজনের রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি না হয় ততক্ষণ গুলি চলতে লাগল। সাজে-পোশাকে, গাড়িতে- বন্দুক-রাইফেলে অত্যন্ত শৌখিন। ইজাহারুল হক-এর হাতে ছিল ডাবল ব্যারেল হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের থ্রি সেভেন্টি-ফাইভ রাইফেল—রাজা রাইফেল। যে রাইফেলে দু ব্যারেলে দুটি গুলি নেয়, ফুটে গেলে আবার ভরতে হয় কিন্তু মেসোমশাই-এর ফোর নট ফাইভ একনলা রাইফেলের ম্যাগাজিনে পাঁচটা আর চেম্বারে একটা গুলি যেত। তবে সেমি অটোমেটিক নয় ফলে প্রতিবারই গুলি ফোটার পরে ব্যারেলের নীচের লিভার ধরে টানতে হত। টানবার সময়ে শব্দ হত না কিন্তু লিভারটা বন্ধ করার সময়ে ঘটাং করে একটা বিতিকিচ্ছিরি শব্দ হত। এবং সেই শব্দে বাঘ, লেপার্ড, ভাল্লুক, গাউর, বুনো মোষ অথবা হাতির মতো বিপজ্জনক জানোয়ার শিকারির অবস্থান নির্ভুলভাবে বুঝে নিত এবং অনেক সময়ে শিকারিকে আক্রমণও করত। আমার বাবারও একটা ওই রাইফেল ছিল এবং আমিও ব্যবহার করেছি বলে জানি।

গুলি যখন সব শেষ দু জনেরই, বাঘের তর্জন-গর্জনও তখন শেষ। কিন্তু শেষবার লাফ দিয়ে বাঘটা যে কোনখানে গিয়ে আড়াল নিল, না মরেই গেল তা ওদের কেউই বুঝতে পারল না। ততক্ষণে অন্ধকারও হয়ে গেছে।

ঠায় রাত দশটা অবধি গাছে বসে থেকে, দুজনের গুলিহীন রাইফেল সম্বল করে প্রাণ হাতে করে গাছ থেকে নেমে বড় রাস্তাতে, যেখানে জিপ ছিল, সেখানে এসে পৌঁছল।

আগেই বোধহয় বলেছি যে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও শিকারি কুমুদনাথ চৌধুরী তাঁর বইয়ে বার বার করে লিখে গেছিলেন যে মাচা থেকে বাঘকে গুলি করে, বাঘ যদি মরে না গিয়ে থাকে তবে একেবারেই নীচে নামা চলবে না। লিখেছিলেন বটে কিন্তু তিনি নিজেই ওড়িশার কালাহান্ডিতে দিনের বেলাতে হাঁকা শিকারে বাঘ বেরুলে তাকে গুলি করে আহত করে গাছ থেকে নেমেছিলেন তাকে শেষ করতে কিন্তু বাঘই তাঁকে শেষ করে দিয়েছিল। গুড অ্যাডভাইস ব্যাড এগজাম্পল্-এর এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

টাইগার-লাক বলে একটা কথা আছে শিকারি মহলে তো বটেই, বন-বিলাসী পর্যটকদের মধ্যেও। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সারা

জীবন জঙ্গলে কাটিয়েও একটি বাঘও নিজের চোখে দেখতে পাননি। অনেক শিকারিও আছেন যাঁরা সারা জীবন শিকার করেও একটিও বাঘ মারতে পারেননি।

সুব্রত যখন সীতাগড়ার মানুষখেকোটি মারল ইজাহারের সঙ্গে তখনও ওর নিজের কোনও বন্দুক-রাইফেল ছিল না। হেভি রাইফেল দিয়ে পাখি মারা যায় না বলে মেসোমশায়ের পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ উইনচেস্টার রাইফেল দিয়ে কোনও পাখিও মারেনি। সে অ্যাকাউন্ট ওপেন করল মানুষখেকো বাঘ দিয়ে। এবং বাঘ বলে বাঘ! "ওভার দ্যা কার্ডস" দশ ফিট দু ইঞ্চি বাঘ। অত বড় বাঘ সচরাচর দেখা যায় না।

তার অনেক বছর পরে, তখন সুব্রত গুমিয়ার ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ কোম্পানির বড় অফিসার, গুমিয়া রাইফেল ক্লাব এর প্রতিষ্ঠাতা—কোম্পানির লাল-মুখো সাহেবদের কাছে স্পোর্টসম্যান হিসেবে খ্যাত—তখন তার নিজস্ব বন্দুক, রাইফেল এবং পিস্তলও হয়েছে। বিয়ে করেছে। একটি ছেলে হয়েছে। তার নাম রেখেছে ঋজুদা কাহিনীর নায়কের নামানুসারে ঋজু। তখন ঋজু নাম অপ্রচলিত ছিল। ঋজুদা-কাহিনীগুলির সুবাদে এখন বাংলার প্রতি দ্বিতীয় ঘরে একজন করে ঋজু আছে।

অনেকদিন সুব্রতর খবর পাই না তাই অনুযোগ করে একটি চিঠি লিখেছিলাম ওর নীরবতার জবাবদিহি চেয়ে। ও উত্তরে লিখল, দুটি খবর দেওয়ার আছে। প্রথম, আমার একটি মেয়ে হয়েছে। দ্বিতীয়, আমি একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মেরেছি।

ওর সেই বাঘ মারার গল্পও আনন্দ পাবলিশার্স-এর 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে'র প্রথম পর্বে সবিস্তারে লেখা আছে।

এক্সপ্লোসিভ-এর উঁচু পাঁচিল এবং কাঁটাতার দেওয়া সীমানা পেরিয়ে কী করে একটি বড় বাঘ যে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল এবং তিতির খরগোশ খেয়ে কিছুদিন বেঁচে থেকে শীর্ণ হয়ে পড়েছিল তা জানলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। এক্সপ্লোসিভ-এর কারখানার এক একটি প্লান্ট এক একটি টিলার আড়ালে তৈরি করেছিলেন সাহেবরা যাতে বিস্ফোরণ ঘটলে পুরো কারখানা উড়ে না যায়। তাই কারখানার মধ্যে হেভি রাইফেল ছোঁড়ার অনেক ঝুঁকি ছিল। সুব্রত যেহেতু শিকারি এবং ওই কারখানারই অফিসার তাই সাহেবরা

ওকে ছুটি দিয়ে ওই বাঘ মারার কাজে নিয়োগ করলেন। এক প্ল্যান্ট থেকে অন্য প্ল্যান্ট-এ যেতে নাইট-ডিউটিতে থাকা কর্মীরা কিছুদিন হল বাঘ দেখতে পাচ্ছিল। প্রথম প্রথম ওরা নেশা করেছে বা স্বপ্ন দেখছে বলে অন্যরা হাসি-ঠাট্টা করত। তারপর সত্যি সত্যিই বাঘ ঢুকেছে কারখানার মধ্যে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরে ওই ব্যবস্থা নিলেন কর্তৃপক্ষ। সুব্রতকে একটি জিপ এবং সাহসী ড্রাইভার দেওয়া হল। সুব্রত হাজারিবাগ থেকে নাজিম মিঞাকে আনিয়ে নিল স্পট-লাইট শুদ্ধ। এবং কয়েক রাত খোঁজাখুজির পরে সেই ব্যর্থ প্রেমিক বা আত্মহত্যাকামী বাঘ সুব্রতর হাতে শহিদ হল।

এরকম ঘটনা আর কোথাওই ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। সেই সময়ের গুমিয়ার ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস কারখানার (আই. ই. এল.) লালমুখো ও কালো সাহেবরা এখনও সুব্রতর বাঘ নিয়ে আলোচনা করেন। আই. সি. আই-এর মিস্টার টড হান্টার ছিলেন ওই কারখানার পত্তনকারী। তাঁর নামে একটি বড় টিলা আছে কারখানার মধ্যে। ওই টিলার নীচেই মেরেছিল বাঘটিকে সুব্রত।

সুব্রতর বিয়ে হল মজফফরপুরের মেয়ে অলকার সঙ্গে। বরযাত্রী যেতে পারিনি কিন্তু বউভাতে গিয়েছিলাম। ওরা তখন কানহারী হিল রোডের উপর সারি দেওয়া ইউক্যালিপটাস গাছেদের মাঝে একটি বাড়ি কিনে থিতু হয়েছে মেসোমশায়ের অবসর নেবার পরে। সেই বাড়ির প্রকাণ্ড হাতাতে উত্তর ভারতীয় রীতিতে সার সার তাঁবু ফেলে বউ-ভাতের প্যান্ডেল হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানেই নাজিম সাহেবের স্ত্রীকে প্রথমবার দেখি। কত বড় রসিক মানুষ হলে যে ওই রকম কুশ্রী স্ত্রীকে নিয়ে অমন নিরন্তর রোম্যান্টিকতা করা যায় তা সেই প্রথম জেনেছিলাম। শুনেছিলাম প্রেম শারীরিক সৌন্দর্য-নির্ভর নয়, সেটা পুরোপুরি মনেরই ব্যাপার। সেদিন রাতে সে কথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম।

নাজিম সাহেব তাঁর বিয়ের রাতের কথা দুই অবিবাহিত তরুণকে যখন স্মৃতিমেদুর হয়ে বলতেন তখন তখন আমরা বিয়ে ব্যাপারটা যে কী দারুণ একটা রহস্য ও প্রেমের ব্যাপার তাইই কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হতাম। নাজিম সাহেব সুর করে গান গাওয়ার মতো করে আওড়াতেন :

"কিয়া হ্যায় তুমকো,
মুরিদ য্যাইসা
না জানে ক্যাইসা
দিখাকে আঁচল।"

নাজিম সাহেবের স্ত্রীকে দেখে খুব ধাক্কা খেয়েছিলাম সুব্রতর বউভাতে কিন্তু নাজিম সাহেবের প্রতি এক নতুন ধরনের শ্রদ্ধাতেও অবনত হয়েছিলাম সেই রাতে।

সুব্রতর ছোট ভাই এর নাম ছিল মুকুল। ও এম.এসসি. পাস করে চাকরির অপেক্ষাতে বসে ছিল। খুবই সরল ছেলে। কথায়-বার্তায় মানসিকতাতে সে পুরোপুরি বিহারী ছিল। অ্যাফেক্টেড উচ্চারণে বাংলা বলত। ও বন্দুকে শিকার করত এবং বন্দুক তুলেই দ্রুত গুলি করত নির্ভুল লক্ষ্যে। ওদের একটি কালো অ্যালসেশিয়ান ছিল, তার নাম ছিল বুলেট। বুলেট আর মাসিমার সঙ্গে ওর সময় কাটত। পুলিস-সাহেব রাশভারী মেসোমশাই তখন কানে কম শুনতেন। নস্যি নিতেন। এবং একা একা বসে সন্ধের পরে পেসেন্স খেলতেন। ক্বচিৎ হাজারিবাগ ক্লাবে যেতেন বিশেষ করে যখন গোপালের বাবা পূর্বাচলে আসতেন।

আমার অনেক সুন্দর দিন কেটেছে মুকুলের সঙ্গে এবং মাসিমার স্নেহে। মাসিমা চমৎকার রান্না করতেন। রান্নাঘরে বসে গীতবিতান খুলে মাসিমাকে একটার পর একটা গান শোনাতাম আর মাসিমা রান্না করতে করতে শুনতেন। রান্নাঘর থেকে একদিকে কানহারী পাহাড় দেখা যেত আর অন্য দিকে লাল মাটির বিস্তীর্ণ টাঁড় ও খোয়াই যা গড়িয়ে গিয়ে মিশেছিল বরহি রোডের গায়ে। মাঝে মাঝে বাস ও ট্রাক যেত বরহি রোড দিয়ে—'দ্যা ইউক্যালটা' থেকে দেখা যেত কিন্তু অত দূরে বলে আওয়াজ শোনা যেত না কোনও। সেই বড়হি রোডেরই নাম হয়েছে এখন গয়া রোড।

আজ পেছন ফিরে চাইলে মন বড় মেদুর হয়ে ওঠে। আমার মা ও বাবা, সুব্রত ও গোপালের মা ও বাবা এবং সুব্রত ও গোপাল কেউই নেই। এই লেখার একটি অংশ যখন পুজোর সময়ে 'আজকাল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল তখনও এ.বি. কাকু ছিলেন। এ. বি. কাকুও গত মাসে চলে গেলেন।

অনেকদিন আগে, দু হাজার সনে কটকের ফুটুদার মৃত্যুর পরে চাঁদুবাবু আমাকে একটি চিঠিতে একটি ওড়িয়া কহবৎ লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। সেটি এরকম :

“কেহি রহি নাই
রহির নাই
রহিব না এটি।
এই ভব রঙ্গ।
ভূমিতলে
সর্বে নিজ নিজ
অভিনয় সারি
বাহরিবে কালবেলে।।”

মানে হল, কেউ থাকবে না, থাকার জন্যে আসে না, এখানে থাকবে না, এই রঙ্গ মর্ত্যভূমির সবাই নিজ নিজ অভিনয় সেরে সময় হলে চলে যাবে।

ভুতো

ভুতোর ক্রিয়াকাণ্ড সব লিখতে হলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। ওর ভাল নাম ছিল ভূতনাথ সরকার। ও আমাদের চেয়ে বয়সে বছর দশেকের ছোট ছিল কিন্তু ক্ষণজন্মা ছিল। স্কুলে ও ক্লাসে ফারস্ট হত নাকি। কোন স্কুলে পড়ত তা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ও যেমন বুদ্ধিমান ছিল যে ওকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ ঘটেনি। কী কারণে ওর বাবা ওকে খুব মারধর করে দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নাকি একতলাতে ফেলে দেন। তারপর থেকেই ও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। সবরকম নেশা করতে থাকে—রেসের মাঠে যাওয়া শুরু করে। কিন্তু মেকানিক ও ছিল খুব বড় মাপের। এক কথায় ব্রিলিয়ান্ট।

নাজিম সাহেব আমাদের দু বেলা দাবড়াতেন। ছুঁওড়াপুত্তান বলে ডাকতেন। তিনি যেহেতু বয়সে অনেকই বড় এবং আমাদের হাজারিবাগি লোকাল গার্জেন ছিলেন ওঁকে আমরা ঘাঁটাতাম না। গোপাল তখন কলেজের ছাত্র, একবার চাতরার জঙ্গলে প্রখর গ্রীষ্মে শিকারে গিয়ে প্রায় মারাই যেতে বসেছিল। নাজিম সাহেবের সেবা-যত্নে সে প্রাণ ফিরে পায়। নাজিম সাহেবই গোপালের বাবাকে কলকাতাতে ট্রাঙ্ককল করে খবর দেওয়াতে মাসিমা ওদের ব্যুইক এইট গাড়ি ও ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে এসে গোপালকে গাড়ি করেই নিয়ে যান কলকাতাতে। গোপালের মা-বাবা গোপালকে খুব পুতু পুতু করে রাখতেন। এটা কোরো না, ওটা কোরো না করতেন সব সময়েই অধিকাংশ বাঙালি বাবা-মায়ের মতন। আমার বাবা এসব ব্যাপারে মহাদেব ছিলেন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, যা করছি তাতে বিপদ হতে পারে কি না এসব নিয়ে ভাববার অবকাশই তাঁর ছিল না, উল্টে সমস্তরকম বিপজ্জনক কাজে উৎসাহ দিতেন। এ জন্যে গোপাল আমার বাবাকে খুবই

শ্রদ্ধা করত। বলত মেসোমশাই-এর মতো বাবা পেয়েছ, তুমি ভাগ্যবান। বাঙালিদের মধ্যে এমন বাবা সত্যিই দেখা যায় না।

সেই নাজিম সাহেবকেই ভুতো প্রথম আলাপেই একেবারে ল্যাজে-গোবরে করে দিয়েছিল। ভুতো সবসময়েই ওর মামাবাড়ির আমবাগানের গল্প করত। সেই আমবাগানের বড় বড় গাছে কী অসামান্য পারদর্শিতাতে সে উঠত এবং গাছে বসেই আম খেত তার গল্প করত আমাদের সবিস্তারে। আমরা শুনতাম, নাজিম সাহেবও শুনতেন।

একবার গরমের দিনে আমরা হাজারিবাগে গেছি। শুক্লপক্ষ। সন্ধের পরেই চাঁদ উঠেছে। সকলে মিলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। 'পূর্বাচল'-এ ফিরে আসছি। নাজিম সাহেব ভুতোকে গোপালদের বাড়ির ইউক্যালিপটাস গাছগুলো দেখিয়ে বললেন, আরে এ ভুচু! তুমহারা মামাবাড়িকি আমগাছমে চড়নেকা বহত গপ তো শুনায়া—ইউক্যালিপটাস গাছমে চড়নে শেকোগে? তুমহারা গাঁড় টুট যায়েগা হাঃ।

ভুতোকে নাজিম সাহেব ভুচু বলে ডাকতেন এবং প্রথম থেকে ওর ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখে ওর উপরে রাগ ছিল নাজিম সাহেবের। ভুতো নাজিম সাহেবের পেছনে লেগেও থাকত সবসময়ে। নাজিম সাহেবের কথার কোনও উত্তর দিল না ভুতো। বাড়ির হাতাতে ঢোকার পরে ভুতো বিনা বাক্যব্যয়ে চটি জোড়া ছেড়ে, যেমন করে খেঁজুর রসের হাঁড়ি পাড়তে লোকে পায়ে দড়ি বেঁধে খেজুর গাছে চড়ে তেমন করে দড়ি ছাড়াই সট সট করে মসৃণ ইউক্যালিপটাস গাছে উঠে যেতে লাগল—উঠে প্রায় মগডালে পৌঁছে একটা সরু ডালে দু পায় লটকে সার্কাস করতে লাগল আর বলতে লাগল, এ বুড্ডয়া। হাম হিয়াসে গিড় যানেসে হামারা মামালোগ আকর আপকি খাল খিঁচ লেগা। নাজিম সাহেব দু হাত জড়ো করে বলতে লাগলেন, আরে ও বাবা ভুচু নিচুমে উতর আ যা বাবা—তু সাচমুচ গিড় পড়েগা হুঁইয়েসে। ভুতো সার্কাস করতে করতে বলল, ম্যায় নেহি উতরেগা, আপ বোলিয়ে আপকি গাঁড় টুটা হ্যায়, তবহি ম্যায় উতারকে আওবেগা।

উতর আ বাবা। উতর আ......।

ভুতো বলল, নেহি উতরেগা। বোলিয়ে আপ কো গাঁড় টুটা হ্যায়।

অমন বিপদে মহম্মদ নাজিম জীবনে পড়েননি। বলতে লাগলেন, উতর আ বাবা। ভুতো নাছোড়বান্দা। অবশেষে নাজিম সাহেবকে হার মানতেই

হল। নাজিম সাহেব বললেন, হাঁ। হাঁ। হামারা টুট গ্যায়া। ভুতো বলল, বলিয়ে গাঁড় টুটা। নাজিম সাহেব বললেন, মান লিয়া রে—টুটা, টুটা, হামারা গাঁড় টুটা।

তারপর ভুতো কাঁড়িয়ে পিরেতের মতো সড়াৎ সড়াৎ করে নীচে নেমে এল।

আমরা সকলে দোর্দন্ড প্রতাপ নাজিম সাহেবের ওই দুর্দশা দেখে হাসি চাপতে না পেরে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। জংলী ঘোড়া যে ভাবে বশ করে সে ভাবেই ভুতো নাজিম সাহেবকে বশ করল। তারপর থেকে নাজিম সাহেব ভুতোকে আর কখনও ঘাঁটাননি।

আরেকবার প্রচণ্ড শীতে হাজারিবাগে গেছি। গোপাল বলল, একটা জিপ জোগাড় করতে পারো লালা! সুব্রত তখন গুমিয়াতে। মুকুলও চাকরি পেয়ে চলে গেছে কলকাতার কাছে এক সাহেবি কোম্পানিতে। আমি ডালটনগঞ্জে মোহন বিশ্বাসকে ফোন করে বললাম, মোহন একটা জিপ পাঠাও কালকে। পরশুই ফেরত পাঠিয়ে দেব। ডালটনগঞ্জ থেকে লাতেহার চান্দোয়া টোড়ি বাঘড়া মোড় সীমারিয়া হয়ে জিপ এসে পৌঁছল। গোপালের এক জান-চিন স্যাঙাৎ ছিল হান্টারগঞ্জে। আমরা বিকেল বিকেল রওনা হলাম। ভীষণই ঠাণ্ডা। গোপাল বলল, এক বোতল রাম সঙ্গে নেওয়া ভাল। তখনও আমরা মদ্যপান করি না। ওষুধ হিসেবেই রাম নেওয়া হল। নাজিম সাহেব বললেন, রাম্ ঔর আন্ডা বহতই মানহুস হোতি হ্যায়। ওসব লেকর শিকারমে যানা নেহি চাইয়ে। আমরা কথা শুনলাম না। গোপাল চমনলালকে বলল, মশলা বেটে রাখতে। আমরা হান্টারগঞ্জ থেকে হরিণ মেরে ফিরে এলেই ফটাফট রান্না করতে হবে।

বড়হি থেকে আরও আগে গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোডে ডোভির পথে গিয়ে সে রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের পাহাড়ে হান্টারগঞ্জে যাবার রাস্তা।

প্রচণ্ড ঠান্ডা। সত্যিই প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। হাজারিবাগ আর বহরমপুরের মশা ছিল কুখ্যাত আর আলমোড়ার মাছি, কিন্তু হাজারিবাগ আর বহরমপুরের শীত-গ্রীষ্মের কুখ্যাতিও কম ছিল না। মিলিটারি জিপে গরম জামাকাপড়, মাথায় টুপি, হাতে গ্লাভস পরে তো রওয়ানা হওয়া হল। *গোপালের ভাষাতে ড্রাইভারের চেহারাটা জিপের শক অ্যাবজর্বারের মতো।*

ঠান্ডায় সেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত গলায় চাদর জড়ানো ড্রাইভারের অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়। সে স্টিয়ারিং শক্ত করে দুহাতে ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি তো সে চালাচ্ছে না, মনে হচ্ছে গাড়িই তাকে চালাচ্ছে। ঠান্ডাতে হাত কুঁকড়ে যাওয়াতে স্টিয়ারিং ডাইনে বাঁয়ে কাটাচ্ছেই না। খানা-খন্দ যাই থাকুক পথে। জিপ সোজা চলেছে এবং ঘটাং ঘটাং করে গাড্ডায় পড়ছে প্রতি সেকেন্ডে।

নাজিম সাহেব সেই ড্রাইভারের ড্রাইভিং-এর রকম দেখে বললেন, ক্যা ড্রাইভার সাব, নিমন গীতিয়া না গাওয়েব, সরকারনে না পাকড়ায়েব?

হ্যায় না?

আমরা, কেউই কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না।

সমস্বরে বললাম, মৎলব?

ড্রাইভার কোনও কথাই বলছিল না। একেবারেই নীরব।

নাজিম সাহেব বললেন উও কিসসা বাতায়গা! পহিলে ভুচু যাও, স্টিয়ারিং-পর বৈঠো, বাদমে বাত করেগা।

ড্রাইভার খুশি মনেই স্টিয়ারিং ভুতোকে ছেড়ে দিয়ে পেছনে গিয়ে নাজিম সাহেবের পাশে বসল। আমি আর গোপাল সামনে বসেছিলাম।

ভুতোর পরনে একটি ফেডেড জিনস, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি ডোরাকাটা স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। ওই শীতে ওই পোশাক পরে ও কী ভাবে বেঁচেছিল তা ওই জানে। কিন্তু উঃ আঃও করছে না। একেবারে নির্বিকার মহাদেব।

ভুতো, জিপ গিয়ারে ফেলে নাজিম সাহেবকে বলল, হাঁ মিঞা, অব বোলিয়ে। যেন ইয়ার! আমরা যখন সম্ভ্রমের সঙ্গে নাজিম সাহেবকে 'নাজিম সাহেব' বলে সম্বোধন করি তখন ভুতো সেই ইউক্যালিপটাস কাণ্ডের পর থেকেই তার ঠাকুর্দার বয়সী নাজিম সাহেবকে নাম ধরে ডাকত 'নাজিম' বলে। কখনও কখনও বলত মিঞা।

নাজিম সাহেব বললেন, এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল। রাজা গান-বাজনা শুনতে খুব ভালবাসতেন। নানা বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েকে আমন্ত্রণ করে এনে গান শুনতেন। তাঁদের জবরদস্ত তোফা দিতেন। এদিকে সেই মন্ত্রীর এক সুন্দরী তরুণী সুগায়িকা বাইজী রক্ষিতা ছিল। মন্ত্রীর খুবই ইচ্ছে যে সে

একদিন রাজাকে তার রক্ষিতার গান শোনাবে। অনেকদিন ধরে বলতে বলতে রাজা বললেন, ঠিক আছে মন্ত্রী নিয়ে এসো কাল তোমার গাইয়েকে।

মন্ত্রী তো বেজায় খুশি। নিয়ে গেলেন তাঁর রক্ষিতাকে। রাজা যখন গান গাইতে বললেন তখন সেই বাইজী কাঁকাঁ কিঁকিঁ কুঁকুঁ শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল। মিনিট দু তিন শুনেই রাজা বললেন, ঈ, ক্যা হো রহা হ্যায়? নিকালিয়ে মন্ত্রীজী, নিকালিয়ে উনকি।

বাইরে চার ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি তৈরিই ছিল। মন্ত্রী তো তাঁর রক্ষিতাকে তাতে তুলে দিয়ে বললেন, রাতমে মিলেঙ্গে।

রাতে যখন মন্ত্রী গেলেন রক্ষিতার কাছে রাজকার্য সমাপন করে, গিয়ে খুব রাগ করলেন রক্ষিতার উপরে। বললেন, কত সোনা দানা ধন রত্ন পেতে পারতে রাজার কাছ থেকে, তুমি তো সত্যিই ভাল গাও। ওটা কী করলে তুমি? ছিঃ ছিঃ। এমন অসম্মান করলে আমাকে!

বাইজী হেসে বলল, আপ মন্ত্রী হোনে শকতা মগর অকল থোড়া কম হ্যায় আপকি।

মৎলব?

মৎলব, ম্যায় আচ্ছি গাতিথি তবতো রাজা মুঝকো হারেমমেহি ভর দেঁতে থে। আপ আতাথা কিসকি পাশ? "নিমন গীতিয়া না গায়েব, সরকারমে না পাকড়ায়েব।" মানে হল, ভাল গান গাইব না, গাইলে রাজার হারেমে.....

ভুতো বলল, তা তো বুঝলাম কিন্তু মোহনদার পাঠানো জিপের ড্রাইভারকে একথা বললেন কেন আপনি? মানে বুঝলাম না।

বুঝলে না? ড্রাইভার যদি ভাল করে গাড়ি চালাতেন তবে তো এই ঠান্ডাতে সারা রাত খোলা জিপ চালাতে হত। চালাক বলে উনি এমন করেই চালালেন যে তাঁর হাত থেকে স্টিয়ারিং তোমাকেই দিতে হল।

বলেই, বললেন, ক্যা ড্রাইভারসাব, ঠিক্কেই না বোলিন।

ড্রাইভার সাহেব, এন্ডির চাদরে কান মাথা গলা ঢেকে তখন গভীর নিদ্রাতে। কোনওরকম উচ্চবাচ্যই করলেন না।

হান্টারগঞ্জে আমরা শীতের রাতের সাতটাতেই পৌঁছলাম। বেশ উঁচু পাহাড়ের উপরে একটি মালভূমি। হান্টার নামের কোনও সাহেব বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়তো পত্তন করেছিলেন জায়গাটার, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ,

হ্যামিলটনগঞ্জ, ফোর্বস গঞ্জেরই মতো কিন্তু এখন দেঁহাতি বস্তি প্রায়। খুব ভাল বাজরা হয়েছে। আর বাজরা খেতেই গোপালের ওখানকার চেনা শনিচরোয়া আমাদের জিপ ঢুকিয়ে দিল। একটা বিরাট দল স্পটেড ডিয়ারের, বাজরা খেতে বাজরা খাচ্ছিল। হড়বড়িয়া-খড়বড়িয়া গোপাল নিশানা না নিয়েই গুলি করে দিল। আমি আর নাজিম সাহেবও করলাম—নিশানা কেউই নিলাম না—গুলি হল অ্যাট দ্যা জেনারাল ডিরেকশান—শীতে আঙুল কুঁকড়ে ছিল—আমার আঙুল গ্লাভস পরা থাকাতে পিছলে গেল। সে রাতে ভাগ্য হরিণদের সদয় ছিল আর আমাদের নির্দয়। গুলি ফসকে যাওয়াতে গোপাল নির্দেশ দিল ভুতোকে—আরও আগে করো জিপ। অন্ধকারে অন্ধর মতো জিপের অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল ভুতো আর জিপ গিয়ে পড়ল একটি নালার মধ্যে। অনেকক্ষণ এবং গ্রামের অনেক মানুষের সম্মিলিত চেষ্টাতে গাড্ডা থেকে জিপ উদ্ধার করে খালি হাতে আমরা হাজারিবাগমুখো হলাম। অনেকখানি পথ। পূর্বাচল-এ ফিরতে ফিরতে রাত দশটা হয়ে যাবে। আর ওদিকে চমনলাল মাংসের মশলা বেটে বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছে।

আমাদের কষ্টের তো সেই সবে শুরু। তখন কি আর জানি কপালে আরও কত দুর্ভোগ আছে।

শিকার তো হলই না, যখন অকুস্থল থেকে ফিরে আসছি হান্টারগঞ্জের পাহাড়ী ঘাটের ঘনবনাবৃত পথ দিয়ে, হঠাৎই কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ আওয়াজ করে জিপটা থেমে গেল। থেমে গেল না বলে বলা উচিত কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলল। জিপটাকে, তার প্রাণ থাকতে থাকতে ভুতো বুদ্ধি করে বনপথের বাঁদিকের উঁচু জঙ্গলময় ডাঙার গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল যাতে অন্য যানবাহনের যাতায়াতের অসুবিধা না হয়। তবে সে পথে যানবাহন ছিলই না। আসার সময়েও একটিও যান চোখে পড়েনি। পরে জেনেছিলাম সূর্যাস্তের আগে একটি বাস নামে হান্টারগঞ্জ পাহাড় থেকে—নেমে, পাকা রাস্তাতে পড়ে বাঁদিকে গিয়ে দোভিতে পৌঁছায়। নবাব শের শাহর পত্তন করা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এর উপরে। তারপরে সেখানে প্যাসেঞ্জারদের চা-পানি খাইয়ে রোদ ওঠার পরে গয়ামুখো যায়। সেই বাসই আবার ফিরে আসে হান্টারগঞ্জে বিকেল বিকেল—হান্টারগঞ্জ পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নেমে আসে।

কী ব্যাপার? জিপ থেমে গেল কেন আর্তনাদ করে? কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুতো পার্টি হো হো করে হেসে উঠল রাতের শীতার্ত বনপথকে সচকিত করে। আমরা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। তখন ড্যাশবোর্ডের আলোও জ্বলছিল না তাই দেখাও কিছু যাচ্ছিল না। গোপাল আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

আমি ভুতোকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?

ভুতো বলল, তেল শেষ।

গোপাল বলল, তেল শেষ মানে?

আমি বললাম, মোহনের তো ট্যাঙ্ক ফুল করেই পাঠানোর কথা।

নাজিম সাহেবও তো জিপ নিয়ে কাচারীর কাছের পেট্রোল পাম্প থেকে ট্যাঙ্ক ফুল করে এনেছিলেন আমরা পুর্বাচল থেকে বেরোবার আগে।

—তব ক্যাইসে অ্যাইসা হুয়া?

ভুতো হাসতে হাসতে বলল, আরে মিঞা তেল ভুতনে পী লিয়া হোগা। ইস পাহাড়ো জঙ্গলমে বহত ওর বহত কিসিমকি ভুত হ্যায়।

নাজিম সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, মজাক মত করো আভ্‌ভি। আভ্‌ভি করনা ক্যা ওহি শোচো।

তারপর নিজেই বললেন, করনা ক্যা? যো বাস সুব্বে চার বাজি উৎরোগে পাহাড়সে, ওহি বাসমে বৈঠকর দোভি যা কর পিট্রোল লাতা হ্যায়। হাজারিবাগ কব লওটনে শেকোগে উও খুদা মালুম।

খবরের কাগজের ভাষাতে যাকে বলে "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" তাই হয়ে জিপের মধ্যে বসে থাকলাম আমরা। তিনদিকে খোলা অ্যামেরিকান আর্মির ডিজপোজাল থেকে কেনা জিপ। ১৯৫৯-তে পাটনাতে জীবনের প্রথম পেশার কাজ, পাটনার ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে সওয়াল করে কেস জিতে আসতে আমার বাবা পানাগড়ের ডিসপোজাল থেকে ৪৮০০ টাকা দিয়ে একটা চলন্ত জিপ আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। ওই টাকাতে আজকাল মোটরাইজড সাইকেলও পাওয়া যাবে না। হান্টারগঞ্জের এই ঘটনা ঘটে ১৯৫৮ সনের শীতকালে।

রাত যত বাড়ে শীত তত বাড়ে। আমি ভুতোর দিকে চেয়ে দেখি গায়ে ডোরাকাটা সুতির একটি পাতলা গেঞ্জি, নিম্নাঙ্গে ফেডেড জিন্‌স আর পায়ে

হাওয়াই চপ্পল পরে পরমানন্দে বসে বেসুরে, হিন্দি ফিল্মের গান গাইছে। ড্রইভারের তাও চাদর ছিল, পায়ে মোষের চামড়ার নাগরাও ছিল। নাজিম সাহেবের গায়ে অ্যামেরিকান ডিসপোজালের জার্কিন। ডিবে থেকে বের করে পান খাচ্ছেন মাঝে মধ্যে কালি-পিলি জর্দা দিয়ে আর মাঝে মাঝে কাঁচি সিগারেট। আমাদের পায়ে মোজা, গরম কাপড়ের ট্রাউজার, কোট, ওভারকোট, মাথায় টুপি—তাতেও ঠান্ডাতে জমে যাচ্ছি। জিপ থেমে থাকাতে জিপের ইঞ্জিনের গরমও আর নেই। কুমেরু সুমেরু দুইই এক ঠাঁই হয়েছে।

আমি বললাম, ভাগ্যিস রামটা আনা হয়েছিল। এই ঠান্ডার থেকে আজ রাতে ওই রামই বাঁচাবে।

নাজিম সাহেব বললেন, এতবার মানা করলাম তা ছুঁওড়াপুত্তানরা শুনলেন কেউ? ওই সব আনাতেই তো এই মুসীব্বত।

ভুতো পার্টি বলল, ক্যা মুসীব্বত? মিঞা, আপ জানসে বাঁচ গ্যায়া যো ভুতনে জিপকি পেট্রোলহি পীয়া, আপকি খুন নেহি পী গ্যয়া।

নাজিম সাহেব বেজায় চটে গিয়ে ভুতোকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ রহো বদতমিজ।

অনভ্যস্ত গোপাল আর আমি রাম-এর বোতল-এর ছিপিতে রাম ঢেলে দু-তিন ছিপি খেলাম। নাজিম সাহেব মুখে রাগ করলেও প্রাণ বাঁচাতে খেলেন একটু। আমি গোপালকে বললাম, ভুতো ছেলেটা আজ মরেই যাবে। ওর মামাবাড়িতে ওর ডেডবডি পৌঁছতে হবে তোমাকেই। ওকেও ছিপিতে ভরে রাম দাও একটু—নইলে সত্যিই ও প্রাণে বাঁচবে না।

তারপর বললাম, ভুতো এসব কড়া জিনিস—আমরা একেবারেই খাই না। ঠান্ডার ভয়েই এনেছিলাম। এক ছিপি খেয়ে নাও, গা গরম হবে।

ভুতো পার্টি বলল, বোতলটা দিন, আমিই ঢেলে নিচ্ছি—অন্ধকারে এদিক-ওদিক পড়ে যাবে। সেই কথাতে গোপাল হাত পেছনে করে রাম-এর সাড়ে সাতশো মিলিলিটারের বোতলটা ভুতোর দিকে এগিয়ে দিল। এমন সময়ে শিশিরভেজা লাল মাটির পথ বেয়ে কী একটা বস্তুকে আসতে দেখা গেল। কী জিনিস দেখবার জন্যে আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। ড্রাইভার পেছন থেকে ভয়ার্ত গলাতে বলল, বা-বা-বা বাঘ।

বাঘ?

হতেও পারে। চাঁদ যতটুকুও বা আছে—গাছপালার চন্দ্রাতপের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তার আলো পথে পড়ছেই না বলা চলে। একটু পরই সবিস্ময়ে আমরা সবাই দেখলাম, বাঘ নয়, বাঘের প্রিয় খাদ্য, বড় বড় কানওয়ালা একটা গাধা হেঁটে আসছে, রাতের বনের সব ভয়কে ডোন্ট কেয়ার করে।

গাধাটা আমাদের জিপকে অতিক্রম করে চলে গেল হান্টারগঞ্জের দিকে। মনে হল সেটা কোনও অলৌকিক গাধা নইলে এই জঙ্গলে একাধিক বাঘ থাকা সত্ত্বেও কোনও গাধা পরম গাধামি করে বনপথে বেরোত না এবং এমন বীরদর্পে হেঁটেও যেত না।

গোপাল ফিসফিস করে বলল, অলৌকিক গাধা। এর মালিক হয়তো ছিল হান্টারসাহেবের ধোপা—যারা সকলেই বহুযুগ আগে গত হয়েছেন।

ভুতো বলল, হান্টারগঞ্জে এমন হতেই পারে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে ম্যাকলাক্সিগঞ্জে কাব্রাল সাহেবকে রাতের বেলাতে প্রায়ই দেখা যায় ম্যাকলাক্সিগঞ্জের স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-এ নিজের মুণ্ডুটি বগলতলিতে চেপে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ছমছমে জ্যোৎস্না রাতে।

গোপাল বলল, বুলশিট।

নাজিম সাহেব বললেন, উয়ো গাধা নেহি থা।

—তব ক্যা থা?

ভুতো বলল।

—উয়ো ইন্টেলিজেন্ট থা।

—ইন্টেলিজেন্টকি দুম হোতা হ্যায়, না ঐসা বড়কা বড়কা কান? না চার পায়ের?

জাদাই হোতা দো-পায়েরকা, তুম যেইসা, মগর চার পায়েরওয়ালা ইন্টেলিজেন্ট ভি হোতা হ্যায়।

গাধা দেখে নিজেরা গাধা বনে গেছি যখন, তখন আমাদের রাম-এর বোতলটার খেয়াল হল। শুনতে পেলাম, পেছন থেকে ঢক-ঢক-ঢক-ঢক করে আওয়াজ হচ্ছে। চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখি ভুতো রাম-এর বোতলটা থেকে জল খাওয়ার মতো ঢকঢকিয়ে রাম খাচ্ছে। আমরা "মরে

যাবে। মরে যাবে”। “এটা ওষুধ, অমন করে খায় না” ইত্যাদি বলতে বলতেই ভুতো পার্টি বোতলটাকে নিঃশেষ করে গোপালের হাতে ফেরত দিল। দিয়ে বলল, এতজন দাবিদার, কিনলেনই যখন তখন মোটে একটা কিনলেন।

ভুতোর বয়স তখন বেশি হলে ষোলো-সতেরো হবে। বেশি তো নয়ই, কমও হতে পারে।

তারপর নাজিম সাহেব নেমে ভুতোর সাহায্যে কাঠ-কুটো জোগাড় করে, জড়ো করে, নিজের রুমালটা জিপেই রাখা একটি বাঁশের কঞ্চিতে বেঁধে পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে একটু ভেজা ভেজা ভাব করে সেই কাঠ-কুটোর নীচে রেখে দেশলাই ঠুকে আগুন জ্বাললেন। আগুনটা জোর হতে আমাদের ডাকলেন। আমরা গিয়ে আগুনের পাশের ভেজা পাথরে বসলাম।

ভুতো বলল, লালাদা, রাতে হরিণের মাংসর কাবাব আর চাঁপ খাব বলে দুপুরে খুবই কম খেয়েছিলাম। রাত এগারোটা বাজতে চলল। বড় খিদে পেয়েছে।

ভুতো খিদে শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সকলের খিঁদে যেন চাগিয়ে উঠল। কিন্তু খাদ্য-দ্রব্য বলতে তো কিছুই ছিল না সঙ্গে। আধ-ভর্তি দু বোতল জল ছিল। তাও অচিরে শেষ হয়ে যাবে। তবে ওই প্রচণ্ড ঠান্ডাতে জল পিপাসা তখনও পাচ্ছিল না কারোই।

কীভাবে যে সেই রাত গড়িয়ে গড়িয়ে ভোরের দিকে পৌঁছল বোঝা গেল না। আগুনে জুতো শুদ্ধ পা ঢুকিয়ে দিয়েও পায়ের ঠান্ডা কাটছিল না। প্রায়-নগ্ন ভুতোর দিকে তাকিয়ে আমাদের শীত আরও বেড়ে গেল। বাইরে আগুনের সামনেও আর বসা যাচ্ছিল না। মাঝ রাতে সকলে জিপের ভিতরে গিয়ে বসেছিলাম। একে অন্যের শরীরের ওম-এ কতুটুকু উষ্ণতা পাওয়া যায়। দু চোখ ঘুমে ভরে এসেছিল এমন সময়ে ভ্যাঁকো ভ্যাঁকো ভ্যাঁকো করে একটা লজঝড়ে বাস হেডলাইট জ্বালিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে বাল্‌ব হর্ন বাজাতে লাগল। তার ইলেকট্রিক হর্ন ছিল না।

নাজিম সাহেব আমাকে আর গোপালকে বললেন যে সেই বাসে চড়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড-এ ডোভিতে গিয়ে পেট্রল নিয়ে আসতে। নইলে এইখানে অশোকবনে সীতার মতো কতদিন পড়ে থাকতে হবে কে জানে।

আগে জিপ থেকে নেমে সকলে মিলে ঠেলে তাকে পথের আরও বাঁদিকে করা হল যাতে বাস যেতে পারে। তারপর আমি আর গোপাল সেই বাসে দুগগা বলে চড়ে বসলাম। যাত্রী চার পাঁচ-জনই ছিল তবু মাথাতে কাঠের ফ্রেমের উপরে টিনের ছাদ এবং চালু ইঞ্জিনের গরম ছিল তাই ঠান্ডাটা তিনদিক খোলা উপরে ত্রিপলের চাঁদোয়া দেওয়া জিপের চেয়ে বাসের মধ্যেটা তুলনাতে অনেকই গরম ছিল।

ডোভিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সবে ভোর হয়েছে। বাস তো আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রথমেই অভুক্ত আমরা একটা ধাবাতে গিয়ে ডিমের কারি আর গরম রুটি দিয়ে তিন চার কাপ করে গরম চা খেলাম। একটু ধাতস্থ হয়ে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে পেট্রল পাওয়া যায় কি না তারই চেষ্টা করলাম। পেট্রোল নাকি এমনিতে বিক্রি বারণ। বেশি টাকা দিয়ে রাজি করিয়ে একটি বড় জেরিক্যান কিনে সেই জেরিক্যানও অ্যামেরিকার আর্মির ডিসপোজালের, তাতে যতখানি পেট্রল আঁটে তা ভরে যে বাসই ডাল্টনগঞ্জের দিকে যাবে সে বাসের ড্রাইভার-কনডাকটারকে হাতে পায়ে ধরলাম। কিন্তু বাসে পেট্রল নেওয়া বে-আইনি বলে কেউই আমাদের বামাল নিতে রাজি হল না। এসব বাস তো হান্টারগঞ্জে যাবে না। যে বন-পথ পাহাড়ের উপরের মালভূমি হান্টারগঞ্জে চলে গেছে সেই পথ আর পিচ রাস্তার সংযোগস্থলেই আমাদের নামিয়ে দেবে তারপরে কী করা যায় না যায়, ভেবে দেখা যাবে। হান্টারগঞ্জ থেকে পথটা যেখানে সমতলে নেমেছে সেখানে পথের উপরে ইলাজান নদীর ধারে একটি বড় ধাবা ছিল। রাতে লক্ষ করিনি, সকালে করেছিলাম। ঠিক করলাম জিপে যে তিনজন সহযাত্রী ছিলেন এবং যাঁরা অর্ধমৃত অবস্থাতে পরিত্যক্ত জিপে পড়ে আছেন তাঁদের জন্যে গরম গরম কিছু খাবার নিয়ে যাব। তাড়াতাড়িতে জলের শূন্য বোতলগুলি জিপ থেকে নিয়ে আসা হয়নি, ভুতোর শেষ করে-দেওয়া রাম-এর বোতলটিও না—তাই জলের কী ব্যবস্থা হবে ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে থেকে দুটি সাইকেল রিকশা নিয়ে আমরা এগোলাম সেই ধাবার দিকে। এক রিকশাতে পেট্রলের জেরিক্যান অন্য রিকশাতে আমি আর গোপাল। কোনও এক অজানা জায়গাতে পথের উপরেই নানা আনাজ ও শাকসবজি নিয়ে গ্রামের মানুষেরা বসেছিল।

সপ্তাহিক হাট নয়। হাট বসতে বসতে দুপুর গড়িয়ে যায় এবং ভাঙে সন্ধের পরে। সেটি একটি প্রভাতী বাজার। প্রচুর পাকা টোম্যাটো ডাঁই করে রাখা ছিল। আমরা দু'সের টোম্যাটো কিনে কাঁচা টোম্যাটো খেতে খেতে ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ করা রিকশা চড়ে এগোলাম। ততক্ষণে ভাল রোদ উঠে গেছিল কিন্তু তবুও ঠান্ডা ছিল খুবই।

বেলা প্রায় দশটা নাগাদ সেই ধাবাতে পৌঁছে ওঁদের তিনজনের জন্যে এক ডজন ডিম-এর কারি আর কুড়িটা রুটি বানিয়ে নিয়ে মাটির হাঁড়িতে ডিমের কারি আর শালপাতার প্যাকেটে রুটি প্যাক করে নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে যখনই কোনও ট্রাক বা বাস যায়, খুব কমই যেত সেই সময়, তাদের থামিয়ে হাত জোড় করে বলি যে আমাদের একটু পৌঁছে দিতে কিন্তু কেউই রাজি হয় না। অসহায় আমাদের দেখে ধাবাওয়ালা বলল যে, যে বাস হান্টারগঞ্জ থেকে আপনাদের নিয়ে এসেছিল শেষ রাতে তার দয়া নিশ্চয়ই হবে।

গোপাল বলল, কিন্তু সেই বাসতো ভূ-প্রদক্ষিণ করে সন্ধেবেলাতে কি প্রথম রাতে এসে পৌঁছবে।

তার আর কী করা যাবে।

ধাবাওয়ালা বলল।

তারপর বলল, ভাল করে রোদ উঠলে, কাড়ুয়া তেল দেব, তেল মেখে ইলাজান-এ চান করে, প্রাতঃকৃত্য সেরে নাওয়া খাওয়া করুন। শীত লাগবে না তখন। গোপাল বলল, কী দিয়ে খাব?

ঘি আর হিং দেওয়া অড়হড়ের ডাল, ভাত, আলুর চোকা, স্যালাড আর ডিমের ঠেসে লংকা দেওয়া ঝাল—ঝোল।

স্যালাডে কী থাকবে?

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ভীষণই খুঁতখুঁতে গোপাল বলল।

—পেঁয়াজ, মুলো, শসা, টোম্যাটো আর কাঁচালঙ্কা।

ফাসটক্লাস। গোপাল বলল।

আমি ভাবছিলাম, চান টান না হয় করা যাবে তেল মেখে বেলা বাড়লে কিন্তু ভুতো, নাজিম সাহেব আর ড্রাইভারের মুখগুলির কথা মনে করে খাব কোন লজ্জায়।

গোপাল বলল, দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট ইন ট্রাইং টু ড্যু সামথিং হোয়েন দেয়ার ইজ নাথিং টু বি ডান।

সেই উদ্ধারকারী বাস এল সন্ধে লাগার পরে। দয়া হল ড্রাইভারের। সে তো দেখেইছে যে আমাদের সঙ্গীরা পথেই পড়ে আছে কাল রাত থেকে। তেলের জেরিক্যান শুদ্ধ সে তুলে নিল আমাদের পাহাড়ের মাথাতে উঠে দূর থেকে দেখতে পেলাম পথের পাশে আগুন করে নাজিম সাহেব শবাসনে বসে আছেন আর ভুতো জিপের সামনের সিটে কুকুরকুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তখন রাত সাড়ে-সাতটা বাজে। অনেকক্ষণ অন্ধকার নেমে এসেছে, মাঘ মাসের রাত। ড্রাইভার নাজিম সাহেবের পাশে আগুনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বিলাপ করছে নিচুগ্রামে।

বাস থেকে নেমেই আমরা বললাম, আগে খেয়ে নাও তোমরা। ডিমের কারি আর রুটি এনেছি। আমরাও তাই খেয়ে এসেছি।

নাজিম সাহেব এবং রহমান সাহেব হাঁড়ির উপরে হামলে পড়ল। এদিকে নতুন মাটির হাঁড়ি ডিমের ঝোল সব শুষে নিয়েছিল। হাঁড়ির নীচে কয়েকটি তৈলাক্ত ডিম গড়াগড়ি খাচ্ছিল। প্রচণ্ড খিদেতে তাই রুটি মুড়িয়ে মুখে দিতেই গলাতে ডিম-রুটি আটকে গেল। গোঁ-গোঁ-গোঁ করে আওয়াজ করতে লাগলেন দুজনেই আর একটা গোঙানি উঠতে লাগল টাগরা থেকে পানি, পানি, পানি করে। কিন্তু পানি কোথায় পাব আমরা?

ভুতো জিপের গ্লাভস চেম্বার খুলে এক বোতল জল বের করে আনল মন্ত্রবলে। সেই জল ঢকঢকিয়ে খেয়ে নাজিম সাহেব আর রহমান ড্রাইভারের প্রাণ বাঁচল সে যাত্রায়।

পানি কাঁহাসে মিলা রে ভুচু?

খাওয়া সেরে জল খেয়ে প্রশ্ন করলেন নাজিম সাহেব।

কাহে? নদ্দীসেহি লায়া। এক বুতলতো পী লিহিন আপ—দোনো। ওর ইক বুতল ম্যায় রাখ দিয়া থা।

ড্রাইভার আর ভুতো মিলে তেল ঢালল ট্যাঙ্কে। তার আগে পথচলতি একজন দেহাতির কাছ থেকে এক টুকরো কাপড়কাচার সাবান পয়সা দিয়ে কিনে রেখেছিলেন নাজিম সাহেব। তাই দিয়ে তেল ঢালার আগে পেট্রল ট্যাঙ্কের সম্ভাব্য অসম্ভাব্য জায়গার ফুটোফাটা আটকে দেওয়ার কাজ তাঁরা সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন। পেট্রল ঢালা হতেই আমরা জিপে উঠে বসলাম। পাশের জমিনে লুকিয়ে রাখা বন্দুক তিনটেকে ভুতো তুলে এনে যার যার জিম্মাতে দিল। তারপর স্টিয়ারিং-এ বসে জিপ স্টার্ট করল।

আঃ। কী আরাম, কী স্বস্তি।

গোপাল বলল বেচারা চমনলাল হয়তো এতক্ষণে কলকাতাতে ট্রাঙ্ককল করে মা-বাবাকে বলে দিয়েছে যে দাদাবাবুরা নিখোঁজ হয়ে গেছে।

জিপ হান্টারগঞ্জের পাহাড়ী শীতের ধূলিমলিন কাঁচা পথ বেয়ে নীচের পিচের পথে নামতেই আমার মনে এল ব্যাপারটা। বললাম, ভুতো তুমি কি নিখাস্তি বাবা?

গোপাল বলল, ও যে সিদ্ধ বাবা তা রাতে ওই শুয়োর-মরা শীতার্ত রাতেও ওর পোষাক দেখেও তুমি বুঝলে না?

পোশাক দেখে তো হতবাক হয়েই ছিলাম কিন্তু খিদে-তৃষ্ণাও যে জয় করেছে সেটা তো জানতাম না।

ভুতো বলল, আজ দুপুরে যা ভোজ খেলাম না। তা বলার নয়।

ভোজ? এই জঙ্গলে ভোজ খেলেটা কোথায়?

ভুতো পার্টি ফিলসফারের মতো বলল, মীর সাহেবের শায়রী জানেন না?

গোপাল বলল, না।

ভুতো বলল, "মুদ্দয়ী লাখ বুঢ়া চাহেতো ক্যা হোতা হ্যায়,
ওবহি হোতা হ্যায়, যো মঞ্জুরে খোদা হোতা হ্যায়"।

অর্থাৎ লক্ষ লোকে আমার খারাপ চাইলে কী হবে? খোদা আমার জন্যে যা মঞ্জুর করে গেছেন তাই হবে, তাই হবে।

আমি বললাম, একটু খোলসা করে বলোই না বাবা। ভুতো একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে নাজিম সাহেবের দিকে চেয়ে বলল, সকাল হতেই নাজিম সাহেবের যে কী অবস্থা তা যদি দেখতেন। পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। নাজিম সাহেব 'খুটবা' চাইবার মতো করে পথের দিকে চেয়ে আছেন, যদি আল্লার দোয়া জোটে। পথ দিয়ে মাঝে মাঝেই দেহাতি হিন্দু মুসলমান উপর থেকে নামছে অথবা উঠছে কাঁধে পুঁটলি নিয়ে। কারও কারও বা পুঁটলি নেই, হাতে টাঙ্গি—ক্যাপ কাটতে যাচ্ছে বাঁশ বা গাছের জঙ্গলে। নাজিম সাহেব তাদের প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে বলছে এরে এ বাবুয়া, তেরা ঝোলিমে ক্যা হ্যায় রে? খানেকা কুছ হ্যায়?

নেই খে।

বলে, তারা চলে যাচ্ছে।

একজনের পুঁটলি জোর করে খুলিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে এক জোড়া ধূলিধূসরিত ফেটে-যাওয়া মোষের চামড়ার নাগরা জুতো। মেরামত করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে নীচে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল মাদল ধামসা এবং বেসুরো সানাই বাজাতে বাজাতে রংচঙে পোশাক পরে একদল মেয়ে মদ্দ পাহাড়তলির ইলাজান নদীর বুক বেয়ে চলেছে উত্তরমুখো। কারও বিয়ে আছে সম্ভবত।

ভুতো নাজিম সাহেবকে বলল, ম্যায় দাওয়াত খা কর আতা হ্যায়। বহত ভুখ লাগা নাজিম মিঞা। আপভি চলিয়ে না। রহমানকে লিয়ে খানা লেতে আয়গা যব লওটেঙ্গে।

নাজিম সাহেব সাবধান করে দিয়ে বলল, মত যা ভুচু। নদ্দীমে ভাল নোঁচ লেগা।

অর্থাৎ যাস না ভুচু, নদীতে ভাল্লুকে খাবলে নেবে।

ওই ইলাজান আর জাঁম ফল্গু নদীর শাখা নদী। গয়ার ফল্গু অন্তঃসলিলা, বছরের অধিকাংশ সময়েই কিন্তু ইলাজান আর জাঁম অন্তসলিলা নয়, জল থাকে বছরের অধিকাংশ সময়েই। এই জাঁম নদী পেরিয়ে এক প্রচণ্ড শীতের রাতে শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীতে মধ্যরাতে গোরুর গাড়ি চড়ে একবার আমি গোপাল আর নাজিম সাহেব জৌরী থেকে সিজুয়াহারার পাহাড়ে রঘুশাহর ভাণ্ডার থেকে যখন ফিরে আসছিলাম, পেছন পেছন কাড়ুয়া তার মুঙ্গেরী একনলা গাদা বন্দুক পিঠের উপরে শুইয়ে খালি পায়ে গান গাইতে গাইতে আসছিল তখন নাজিম সাহেব বলেছিলেন জাঁম কি মৎলব জানতে হেঁ।

আমি কী-ই বা জানতাম। মাথা নাড়লাম।

নাজিম সাহেব বললেন, জাঁম মানে, পানপাত্র। তারপরই শায়রী আওড়ালেন,

"অ্যাইসা ডুবাহু তেরি আঁখোকি গেহরাইমে
হাত মে জাঁম হ্যায়, মগর পীনেকি হোঁস নেহি।'

মানে, তোমার চোখের গভীরে এমনই ডুবে আছি যে হাতে আমার, পান-পাত্র ধরা কিন্তু চুমুক দিতেই ভুলে গেছি।

কাড়ুয়ার গানটাও মনে আছে আজ পঞ্চান্ন বছর পরেও

"তু কেহরো কচমচ ছাতি
তুহুর সুরত দেখি মোরা
বসল নজরিয়া হো, বসল নজারিয়া
হো তন বৈবসানা দিনা দেখব নজারিয়া
হো দেখব নজারিয়া।"

যাই হোক নাজিম সাহেবের বারণ না শুনে ভুতো তো তড়তড়িয়ে পাহাড় বেয়ে ইলাজানের বুকে নেমে গেল।

নাজিম সাহেব বললেন, কোঈ হাজামৎকি শাদী হোগা—

হাজামৎ কওন চিজ?

হাজামৎ নেহি জানতা? মহাবীর যেইসী। তুমলোগো কি নাপিত। তারপর বললেন খানা তো নেহি মিলেগী মগর পিটাই মিলেগী। ঔর ইস বিচসে উনলোগ পিট্রোল লেকর আ পঁহুছা তো হামলোগ চল দেগা, তুমহারা লিয়ে রোকেংগা নেহি। সমঝা না?

ভুতো বলল, হাঁ হাঁ সমঝা। পহিলে তো জান বাঁচায়গা তব হি না হাজারিবাগকি বারেমে শোচেগা।

আমি বললাম, তারপর?

ভুতো উত্তেজিত হয়ে বলল, কী যে আদর-আপ্যায়ন করল তারা কী বলব। বরযাত্রীর দলে ভিড়ে গেলাম। আধমাইল দূরেই মেয়েদের বাড়ি। জব্বর খাওয়া হল। এখনও চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। নাজিম সাহেব আর রহমানের জন্যে কটা লাড্ডুও নিয়ে এসেছিলাম আর বোতলে করে নদীর জল।

তারপর বলল, নাজিম মিঞার যত্ত ভয়, ভাল্লুক খাবলে নেবে, বাঘে কামড়ে দেবে। সাহস না থাকলে কিছুই হয় না। তাইতো বলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

চাঁদুবাবু

আপনাদের মধ্যে যাঁরা 'জঙ্গল মহল' পড়েছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই 'আউ গুট্রে দিয়ন্তু' গল্পটির কথা মনে আছে। সেই গল্পটি চাঁদুবাবুরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

চাঁদুবাবুরা বাঙালি হলেও ওড়িশাতেই থিতু হয়ে গেছেন। ওঁর বাবা অমরবল্লভ দে ছিলেন বামরার করদ রাজ্যের দেওয়ান। চাঁদুবাবুর ছোট ভাই খুব নামী গায়নাকোলজিস্ট—বিদেশ থেকে পাস করে এসে সম্বলপুরের বুড়লা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন চাকরি থেকে। তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন কি না জানি না।

চাঁদুবাবুর বাড়ি ছিল কটক শহরের বাখরাবাদে। ভাল নাম সমরেন্দ্রনাথ দে। তবে ভাল নামে ডাকে না কেউই। আমার সঙ্গে যখন চাঁদুবাবুর পরিচয় হয় পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে। তার অল্প কিছুদিন আগেই কটকের খবরের কাগজে তাঁর ছবি বেরিয়েছিল। তার নিচে ক্যাপশন ছিল 'হেট্রোবাঘ শিকারি'।

শহরের মধ্যে কোথা থেকে এক হায়না এসে পড়েছিল এবং সে যখন এক প্রতিবেশীর টয়লেটে ঢুকে পড়ে তখন বাইরে থেকে কড়া, দড়ি দিয়ে বেঁধে চাঁদুবাবুকে ডেকে পাঠান ওঁরা এবং চাঁদুবাবু বন্দুক নিয়ে গিয়ে তাকে এক গুলিতে ধরাশায়ী করেন।

সেই ছবি ছাপা হওয়ার পরে তাঁর বন্ধুবান্ধব, চেনা পরিচিত সকলেই ঠাট্টা করে তাঁকে 'হেট্রোবাঘ শিকারি' বলে ডাকতেন।

মহানদীর কাছেই বিধবা এবং পরমাসুন্দরী মায়ের সঙ্গে পেছনে ছোট্ট

বাগানওয়ালা দোতলা বাড়িতে থাকতেন এবং এখনও থাকেন। খুব যে একটা লম্বা ছিলেন, তা নয়, তবে দুর্দান্ত স্বাস্থ্য ছিল। ওঁর বিল্টটা ছিল আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো—কোমর থেকে ওপরে এবং দু'হাতে সব শক্তি জমা হয়েছিল। একটু তোতলা ছিলেন এবং তাঁর হাঁপানি ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বিশেষ না করলেও প্রচুর পড়াশোনা করতেন নানা বিষয়ে। বন্যপ্রাণী, বনের নানা আদিবাসীদের সম্বন্ধে ওঁর খুব জ্ঞান ছিল। ওঁর এক প্রতিবেশী বন্ধু সনাবাবুর জমিজিরেত ছিল কটকের কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে নিয়মিত গিয়ে বন্ধুর তরফে চাষবাস যেমন দেখতেন, তেমন শিকারও করতেন। তা ছাড়া, কটকের বিখ্যাত ঠিকাদার ও কাঠের ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ সুরের ছেলেরাও চাঁদুবাবুর কাছের মানুষ ছিলেন।

সারা ভারতবর্ষেই বর্ষার সময়ে জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। জঙ্গল খোলে পয়লা অক্টোবরে। প্রতি বছর অঙ্গুলে ডি এফ ও-র অফিসে অঙ্গুল ডিভিশনের নানা জঙ্গল নিলাম হত। যে সব জঙ্গল নিলামে উঠবে সেই সব জঙ্গল সম্বন্ধে বিভিন্ন বড় বড় ঠিকাদার আগেই লোক পাঠিয়ে এবং জঙ্গলের মধ্যের গ্রামের (যেখানে গ্রাম থাকত) মানুষদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে সে জঙ্গলে কী কী গাছ আছে, কতদিনের পুরনো গাছ, জঙ্গলে পৌঁছবার পথ আছে কি নেই, এই সব তথ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর করে রাখতেন। তা সত্ত্বেও নিলামে জঙ্গল ডাকার মধ্যে একটা জুয়া খেলার ব্যাপার থেকেই যেত।

জঙ্গলে রাস্তা বানাতে হত ঠিকাদারদেরই। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার। হাতিদের চলার পথ ধরে পাহাড়ে উপত্যকাতে মার্সিডিস ট্রাক যাওয়ার পথ বানাতে হত। দশপাল্লার বিরিগড় নামের খন্দ আদিবাসী অধ্যুষিত খুব উঁচু পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটি এতই খাড়া ছিল যে ফাঁকা ট্রাক ওঠার সময় বড় বড় পাথর ভর্তি করে উঠতে হত। ওপরের মালভূমিতে পৌঁছে সেই পাথর সব ফেলে দিয়ে কাঠের লগ নিয়ে নামত ট্রাক। ওই বিরিগড়ের পটভূমিতেই আমার 'পারিধি' উপন্যাস লিখেছিলাম। অনেকে বলতেন, বুদ্ধদেব গুহ অশিক্ষিত, তাই 'পরিধি' বানানটিও জানেন না। কিন্তু 'পারিধী' একটি খন্দ শব্দ। মানে, শিকার।

এই উপন্যাসের যিনি নায়ক তাঁর নাম চন্দ্রকান্ত। এই চন্দ্রকান্তর মধ্যে

চাঁদুবাবুর ছায়া ছিল। আর নায়িকা চন্দনী ছিল ওই নামেরই একটি খন্দ মেয়ে। পারিধীর পরের খণ্ডও লিখেছিলাম, তার নাম দিয়েছিলাম 'লবঙ্গীর জঙ্গলে'।

জঙ্গল নিলামে কিনে নেওয়ার পর থেকেই নরেনবাবুর দুই ছেলে প্রভাত এবং অশোক (ফুটু এবং হোঁদল) চাঁদুবাবুকে ট্যাকস্থ করে জিপে উঠতেন। প্রায় ষাট বছর আগের কথা, তখন মহানদীর দুপারে যে গভীর আদিম জঙ্গল ছিল, তা আজ অনুমান পর্যন্ত করা যায় না। অনেক বনের ঠিকাদারেরা আমাদের মক্কেল ছিলেন বলে বিহার (তখন তো ঝাড়খণ্ড হয়নি), আসাম এবং ওড়িশার অনেক আদিম বনের ধ্বংসের নিরুপায় ও নীরব সাক্ষী ছিলাম আমি। এক একটি মহীরুহ যখন তাদের আকাশচুম্বী মাথা, অগণ্য পাখি ও সাপের আশ্রয়স্থলকে নয়ছয় করে মাটিতে সশব্দে আছড়ে পড়ত তখন আমার বুকের মধ্যে হাহাকার উঠত। সেই মহীরুহ কাটত বিরাট বিরাট করাত দিয়ে করাতিরা। মাটিতে পড়লে, সেই সব গাছকে কেটেকুটে বড় বড় 'লগ' করা হত। তবে এত বড় নয় যে ট্রাকে আঁটে না। কাঠের লগ সাইজমতো কাটা হলে মোষ দিয়ে বা বলদ দিয়ে সেই কাঠ পথের পাশে এমন জায়গাতে সাজিয়ে রাখা হত যাতে ট্রাকে লোড করতে সুবিধে হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'ঢোলাই' বলা হত। ঠিকাদারদের মুহুরীরা কাগজ-কলম নিয়ে চশমা পরে বসে সন্ধের পরে ক্যাম্পে বা পাতায় ছাওয়া ঘরে লণ্ঠনের বা হ্যাজাকের আলোতে কত বর্গফুট কাঠ হল তার চুলচেরা হিসেব করত। এই মুহুরীরা কেউ চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল না, অধিকাংশই 'সপ্তম ফেল' বা 'অষ্টম ফেল'। কিন্তু হাবেভাবে তারা ছিল বুর্জোয়া। ধুতি, রাবারের বা প্লাস্টিকের পাম্প শু, রঙিন টেরিলিনের পাঞ্জাবি, কবজিতে এইচ এম টি ঘড়ি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে তারা তাদের 'অথরিটি' নিয়ে গরিবস্য গরিব করাতিদের শাসন করত। করাতিরা সারাদিন, সূর্যোদয় থেকে প্রায় সূর্যাস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পর শীত-গ্রীষ্ম খালিগায়ে তাদের ঝুপড়ির মধ্যে পাশাপাশি শুয়ে থাকত। আর দূর গ্রামে ফেলে-আসা তাদের যুবতী-স্ত্রী, শিশুপুত্র ও কন্যাদের কথা অথবা প্রেমিকাদের কথা ভাবত। বাইরে কাঠের আগুনে তাদের সাধের ভাত বা 'জাউ' ফুটত। তার মধ্যে একটু নুন আর আফিঙের গুঁড়ো ফেলে দেওয়া হত। ওই গভীর বনে তরকারি কোত্থেকে

পাওয়া যাবে? তাদের ডালও জুটত না। সেই ভাত রান্না হয়ে গেলে, তা খেয়ে, পাশাপাশি তারা নিজেদের দেহের উষ্ণতাতে উষ্ণ হয়ে রাত কাটাত। গরমের দিনেও রাতের বেলা নানা বন্য জন্তু ও সাপের ভয়ে তারা বাইরে শুত না। চাঁদুবাবু যতদিন ক্যাম্পে থাকতেন ততদিন তিনিই ছিলেন তাদের রক্ষাকর্তা। হাতি, বাঘ, চিতা, বাইসন এ সব কিছুর হাত থেকেই রক্ষা করতেন তাদের চাঁদুবাবু তাঁর দোনলা বন্দুক নিয়ে। অত্যন্ত রসিক এবং গরিব-দরদী বলে চাঁদুবাবু করাতিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়ও ছিলেন। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন না অবশ্য, কিন্তু তাঁর রসিকতাতে তাদের সকলকে 'গুড হিউমারে' রাখতেন। সেটাই ছিল তাদের কাছে মস্ত পাওনা।

বাবা গাছ কাটতে কাটতে গাছ চাপা পড়ে মারা গেলে পনেরো বছরের ছেলে বাবার শ্রাদ্ধ করে কোরা ধুতি পরে গামছা কাঁধে কুড়ুলটি কাঁধে ফেলে এসে দাঁড়াত। করাতির ছেলে করাতি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম। করাতিদের প্রত্যেকের লিভার বড় ছিল। ভাতের সঙ্গে নিয়মিত আফিঙ খেয়ে খেয়ে। তাদের গড় আয়ু ছিল চল্লিশ বছর।

মুহুরীদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল ও সাহসী শিকারিও ছিল। ঠিকাদারেরাই তাঁদের নিজেদের বন্দুক ও গুলি দিয়ে রাখতেন তাঁদের। বিপদ-আপদ থেকে করাতিদের রক্ষার জন্যে। আর নিজেরা যখন ক্যাম্পে যেতেন মুরগিটা, ময়ূরটা, শজারুটা, হরিণটা আর শুয়োরটা মেরে আনবার জন্যে। Pot-hunting। জঙ্গলে ও ছাড়া তো কোনও উপায়ও ছিল না। তবে চাঁদুবাবু ফুটুদা এবং এ বি কাকুর (অনন্ত বিশ্বাস, চৌরঙ্গির ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানির এক মালিক এবং যিনি সুরবাবুদের জামাই হতেন) সঙ্গে যখন যেতাম, রাইফেল দিয়ে বড় জানোয়ার, যেমন শম্বর বা নীলগাই মেরে দেওয়ার জন্যে কাকুতি-মিনতি করত করাতিরা। হরিণ জাতীয় জানোয়ারের মাংসকে (venison) ওরা বলত 'শিকার'। শিকার আর মাংস ওদের কাছে সমার্থক ছিল—শুধু ওড়িশাতেই নয়, দক্ষিণী রাজ্যগুলি ছাড়া পূর্বী, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের সব রাজ্যের জঙ্গলের অধিবাসীদের কাছেই। ওদের কারোরই তো চিকেন, মটন বা পর্ক কিনে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না, আজও নেই—তাই

শিকার করা মাংসই ওদের কাছে একমাত্র অ্যানিমাল প্রোটিন ছিল—তাও তা জুটত ন'মাসে ছ'মাসে একবার। তবে ওদের বিয়ে-চূড়োতে শুয়োরের মাংস খাওয়াটা মান্য প্রথা ছিল। সঙ্গে স্থানীয় মদ। রুখু রাজ্যগুলিতে ভাত খাওয়াও এক বিলাসিতা ছিল। বিয়ে-চূড়ো ছাড়া ভাতও খেতে পায় না ওরা। চিনামিনা ধানের ভাত, জওয়ার, কখনও মকাই এবং বেশিই শুখা মহুয়া খেয়েই থাকে ওরা। স্থানীয় মদ বলতে হাঁড়িয়া, মহুয়া, পানমৌরি এই সব। আমার "কোজাগর" উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা কিছুটা জানবেন।

কী বলতে বসে কী বললাম এতক্ষণ। আবার চাঁদুবাবুতেই ফিরি। চাঁদুবাবুর এক জোড়া ছুঁচোল গোঁফ ছিল। চোখ দুটি ছিল জবা ফুলের মতো লাল। মাথাতে বড় বড় চুল। ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। মুখে সব সময়েই এক মিচকে হাসি। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ কেউ বন্দুকধারী অপরিচিত চাঁদুবাবুকে দেখলে ডাকাত বলে ভুল করতে পারত সহজেই। তার ওপরে হাঁপানির হাঁপ এবং তোতলামির জন্যে থেমে থেমে বলা কথা শুনলে লোকে আরও ঘাবড়ে যেত। চাঁদুবাবু নিজেই মজা করে একটা গল্প বলতেন। এক জঙ্গলের এক রেঞ্জার চাঁদুবাবুকে প্রথমবার দেখে আঁতকে উঠে তাঁর ঘনিষ্ঠ একজনকে বলেছিলেন 'অমরবল্লভ দে এত্তে বড্ড মানুষ থিলা আর তাংকু এ পুওটা গুট্টে বারুংগা হেল্বা!'

ওড়িয়াতে বারুঙ্গা মানে ভ্যাগাবন্ড।

চাঁদুবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় পুরুনাকোটে। সুরবাবুদের ওই বাড়িতেই। এক দারুণ শীতের রাতে। আমি তখনও ছাত্র।

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদুবাবু বহুদিন মাংস না-খাওয়া তাঁর এক চেলার পাল্লাতে পড়ে একটি ময়ূর মারার চেষ্টা করেছিলেন। সেই গল্প এবং 'আউ গুট্টে দিয়ন্তু'র গল্প শুনে যেমন হেসেছিলাম তেমন বহুদিন হাসিনি। পুরুনাকোট থেকে টিকরপাড়া যাওয়ার কাঁচা পথের ওপরে নরেনবাবুদের জঙ্গলের কাজ দেখাশোনার জন্যেই এক কামরা আর বারান্দাওয়ালা একটি ছোট টিনের চালের বাড়ি ছিল। তার পেছনেই গভীর জঙ্গল আর পাহাড় উঠে গেছে। পুরুনাকোটের চারপাশ ঘিরে ছিল নানা বিখ্যাত বন। বাঘমুণ্ডা, টুম্বকা, লবঙ্গী ইত্যাদি। মহানদীর অন্য পারে ছিল দশপাল্লা, বৌধ এবং ফুলবানি।

টিকরপাড়াতে বড় বড় গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বাদু মহাশোল মাছ আর নানা কুমিরের মেলা ছিল। সেই কুমিরেরা মাছই নয়, মানুষও খেত। নরেনবাবুর মুখে এক সাহেব শিকারির কুমিরের মুখে মৃত্যুর মর্মান্তুদ কাহিনি শুনেছিলাম। হাপুসনয়নে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কিশোর পুত্র আর স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে মেমসাহেবের টি-এইট মডেলের ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে ধীরে ধীরে পুরুনাকোটের পথ বেয়ে কটকের দিকে চলে যাওয়ার ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠত আমাদের, সেই গল্প শুনে।

লবঙ্গীর জঙ্গলে এক সকালে চাঁদুবাবুর সঙ্গে মাইল ছয়েক পাহাড়ে পাহাড়ে হেঁটে একটি বড় পাহাড়ের চুড়োতে পৌঁছে চাঁদুবাবু এক গভীর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকা দেখিয়েছিলেন আমাকে। সেই ছায়াচ্ছন্ন বনে মেয়ে হাতিরা বাচ্চা প্রসব করত। তখন সেই বনে কোনও মানুষ গিয়ে পড়লে তার মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী। তখন হস্তীযূথের পৌনঃপুনিক বৃংহনে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হত। ওই অঞ্চলে প্রচুর হাতি ছিল তখন। বাঘ্বমুণ্ডার দিক থেকে অন্ধকার বা চাঁদনি রাতে তারা দলবদ্ধ হয়ে হেঁটে আসত পুরুনাকোটের বিস্তীর্ণ ধানখেতের পেকে-ওঠা ধান খেতে। ছোট ছোট খড়ের চালের মাচার ওপরে ছেঁড়া বালিশ ও তেলচিটে সতরঞ্চির ওপরে গায়ে কাঁথা আর দু'পায়ের মধ্যে কাঠকয়লার আগুনের কাঙরি নিয়ে নিজেদের পশ্চাৎদেশ গরম রেখে তারা সারা রাত ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হাতি তাড়াবার বিফল চেষ্টা করত। নবান্নর জন্যে সামান্য ধানই বাঁচাতে পারত তারা।

বাঘ্বমুণ্ডার হাতিরা ক্রিশ্চান ছিল কি না জানা নেই, তবে তারা হাতিগির্জা পাহাড়ে জমায়েত হয়ে প্রার্থনা করত। পাহাড়টির নাম হাতিগির্জা ছিল বলেই হাতিদের ক্রিশ্চান ভাবা হত। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, আমার প্রথম দিকের উপন্যাস 'নগ্ননির্জন' এবং পরবর্তীকালের 'পর্ণমোচী'তে এই বাঘ্বমুণ্ডার কথা আছে। 'নগ্ননির্জন' আনন্দ পাবলিশার্স-এর দশটি উপন্যাসের মধ্যে আছে এবং 'পর্ণমোচী' দে'জ পাবলিশিং-এর বই।

চাঁদুবাবুর সঙ্গে দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ও রাতের বেলা মাচাতে বসে কত কিছু না শিখেছি তা বলার নয়। টুম্বকা বন-বাংলোর কাছেই ভীমধারা নামের একটি প্রপাত ছিল। তার নিচে ছিল একটা দহ। তাতে মাছও ধরতাম

আমরা। ওপরের সমতল মালভূমি দিয়ে বয়ে আসা মিনি-নায়াগ্রার মতো ভীমধারার জলরাশি নানা ভাগে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত নীচে প্রপাত হয়ে। ওই অঞ্চলে তখন এতসংখ্যক বড়কি ও ছোটকি ধনেশ ছিল যে বলার নয়। বড়কি ধনেশ মানে, Greater Indian Hornbill আর ছোটকি ধনেশ মানে, Lesser Indian Hornbil। ওড়িয়া নাম ছিল 'কুচিলা খাঁই' ও 'ভালিয়া খাঁই'। কুচিলা, অর্থাৎ Nux vomica গাছে বসে বড় ধনেশরা ফল খেত। ভালিয়া নামের অন্য এক রকম গাছের ফল খেত ভালিয়া খাঁই অর্থাৎ ছোটকি ধনেশ। সূর্য ডোবার আগে ছাইরঙা ভালিয়া খাঁই এরা গ্লাইডিং করে ভেসে ভেসে যখন ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে সূর্যের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত, তখন মনে হত অন্য কোনও গ্রহে বসে রয়েছি।

বড় বড় বাদামি লেজওয়ালা কাঠবিড়ালিরা শীতের ভোরে ঝরঝরিয়ে শীতের শিশিরের বৃষ্টি ঝরিয়ে বড় বড় গাছের এক মগডাল থেকে অন্য মগডালে ঝাঁপাঝাঁপি করত। সে এক দারুণ দৃশ্য ছিল। সংখ্যাতে তারা ছিল অগুনতি।

টুম্বকা বাংলোর সামনে থেকে একটি পথ ভীমধারার জলের পাশ কাটিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে লবঙ্গীতে গিয়ে পৌঁছেছিল। সেই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যর তুলনা ছিল না। উঁচু পাহাড় থেকে নিচের উপত্যকার নালার পাশে এক ঠিকাদারের কামিনদের চান করার পর মেলে-দেওয়া বহুবর্ণ শাড়ির মেলা দেখেছিলাম একবার। সে ছবি চোখে গেঁথে আছে। সেই ঠিকাদারের (নাম ইচ্ছে করেই বলছি না) শিকার এবং নারীর শখ ছিল তাই সে কামিন হিসেবে অনেক নারীই রাখত। দিনে বন্যপ্রাণী শিকার এবং রাতে নারী শিকারই ছিল তার উপরি পাওনা। তার কাছে কাজ করতে আসা কোনও নারীরই রেহাই মিলত না। তার শয্যাসঙ্গী হতেই হত। তাদের বাঁচাবার জন্যে না ছিল কোনও নকশাল ছেলে, না কোনও ট্রেড ইউনিয়ন। সে-ই জঙ্গলের রাজা ছিল। ওই অঞ্চলের কোনও কোনও পাহাড়ি নদীর বালিতে সোনার গুঁড়ো পাওয়া যেত। কামিনদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সেই সব নদীর বালি ছেঁচে সোনার গুঁড়ো উদ্ধার করতে হত। করাতিদের প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজের জন্যে অধিকাংশ নারীই উপযুক্ত ছিল না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ওই কাজই করত। নগ্নিকা

হয়ে বালি ছাঁকত তারা সংস্কারবশে। তাদের সংস্কার ছিল উলঙ্গ না হয়ে ওই কাজ করলে দেবতা অপ্রসন্ন হয়ে সোনা থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন।

ওই অঞ্চলের পাহাড়ে ঘন নীলরঙের অনেক Rock Pegion-ও দেখেছি। পাহাড়গুলিতে ছিল ঝাঁক ঝাঁক সবুজ পায়রা বা হরিয়াল। বট অশ্বত্থের ফল খেত তারা। তাদের গায়ের সবুজ রঙ আলো-চমকানো পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে মিশে যেত।

চাঁদুবাবু একজন ন্যাচারালিস্টও ছিলেন। কত গাছগাছালি পোকা-মাকড়, পাখি ও প্রজাপতি যে তাঁর জানা ছিল, তা বলার নয়।

চাঁদুবাবু প্রায়ই আমাকে রেঢ়াখোলের জঙ্গলের গল্প বলতেন। সম্বলপুর থেকে একটি পথ চারমল, রেঙ্গানি-কানি ও আরও নানা গভীর বনের মধ্যে দিয়ে এসে রেঢ়াখোলে পৌঁছেছিল। বন্য প্রাণীতে সে জঙ্গল গিজগিজ করত। রেঢ়াখোল হয়ে পথ পৌঁছেছিল অঙ্গুলে। চাঁদুবাবুর সঙ্গে কখনও রেঢ়াখোলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, কারণ কটক থেকে অনেক দূর পড়ত বলে ওই জঙ্গল সুরবাবুরা কখনওই ডাকেননি। চাঁদুবাবুর সঙ্গে যেতে পারিনি কিন্তু বছর দশেক আগে মহানদী কোলফিল্ডস-এর অতিথি হয়ে ঝাড়সুগুদা হয়ে সম্বলপুরে গিয়ে যখন ছিলাম কিছুদিন, তখন গাড়ি নিয়ে সম্বলপুর থেকে রেঢ়াখোলে গেছিলাম এক ঘনঘোর বর্ষার দিনে। সে এক অভিজ্ঞতা! ওই অঞ্চলে অনেক কুরুবকের গাছও দেখেছিলাম যা অন্যত্র দেখিনি। কুরুবকের দেশে' নামের একটি উপন্যাসও (ঋজুদা কাহিনী) ২০০৭-এর কলকাতা বইমেলতে সাহিত্যম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখন সম্বলপুর থেকে অঙ্গুল পর্যন্ত রেল-লাইনও বসে গেছে। সিঙ্গল লাইন। মাঝে মাঝেই ট্রেনের গতি ব্যাহত হয় হাতির দলের জন্যে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে যে রেলপথ রাজাভাতখাওয়া ইত্যাদি জায়গাতে গেছে সেই রেলপথেই মতো। সেই রেলপথেও মাঝে মাঝেই হাতিতে যাত্রা ব্যাহত করে এবং রাতের বেলা হাতি ট্রেনে কাটাও পড়ে।

আগেই বলেছি, চাঁদুবাবু খুব পড়াশুনাও করতেন। উনিই আমাকে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের দুটি জীবনীর হদিস দিয়েছিলেন। হেমিংওয়ে আমারও প্রিয় লেখক এবং বিদেশি লেখকদের মধ্যে হেমিংওয়ে, ওয়াল্ট হুইটম্যান

এবং রবার্ট ফ্রস্ট আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছিলেন। বই দুটির নাম Ernest Hemingway—প্রফেসর কার্লোস বেকারের লেখা—হেমিংওয়ের একটি অসাধারণ জীবনী এটি। অন্যটি হেমিংওয়ের বন্ধু A. E. Hotchner-এর লেখা Papa Hemingway। এই বইটিতে কয়েকটি ফোটো আছে। তার মধ্যে একটিতে হেমিংওয়ের জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত কোচবিহারের মহারাজা, (ভাইয়া) জয়পুরের মহারানীর দাদার ছবি আছে। উনিও দারুণ স্পোর্টসম্যান ছিলেন এবং হেমিংওয়ের বন্ধু ছিলেন। এ কথা কম মানুষই জানেন। চাঁদুবাবু আমেরিকান শিকারি Bob Ruark-এর একটি বইয়ের হদিশও দিয়েছিলেন। যদিও সিরিয়াস বই নয়, তবে প্রচণ্ড রসবোধসম্পন্ন। পূর্ব-আফ্রিকার নানা শিকারের কথা তাতে আছে। সুখপাঠ্য বই।

একবার একটি গুণ্ডা হাতির খোঁজে চাঁদুবাবুর সঙ্গে লবঙ্গীর গোণ্ডুলিবনের উপত্যকাতে এক চাঁদের রাতে অনেক মাইল ঘুরেছিলাম। মনে হচ্ছিল অগণ্য নগ্নিকা শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক বছর আগে লানডান-এ 'OH CALCUTTA'-র নাটক দেখতে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা মনে হয়ে গা-শিরশির করে উঠেছিল। ওই নাটকের সব পাত্রপাত্রীই জন্মদিনের পোশাকে মঞ্চে আসতেন। সত্তরের দশকে ওই নাটক লানডান-এর নাট্যজগতে হইহই ফেলে দিয়েছিল।

গেন্ডুলি গাছেদের বটানিকাল নাম আমার জানা নেই, যেমন জানা নেই অনেক কিছুই। আমি ন্যাচারালিস্ট নই, অর্নিথলোজিস্ট নই, লেপিডপটারিস্টও নই। খুবই অল্প জানি আমি। আমার একমাত্র দাবি এই যে আমি ভালবাসতে জানি। প্রকৃতিকে আমি প্রেমিকের চোখ দিয়ে দেখেছি। চাঁদুবাবু এবং জঙ্গলের আরও অনেক বন্ধুবান্ধবেরা অন্য ধাতুতে তৈরি ছিলেন। বাইসন-এর (ভারতীয় গাউরের) চামড়া ছাড়াবার সময়ে চাঁদুবাবুকে আমি দূর থেকে দেখেছি তার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তার যকৃৎ কেটে নিয়ে সারা গা মাথা হাত পা রক্তে লাল করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে। শিকার আমি অনেকই করেছি এবং খুব ভাল মার্কসম্যান হিসেবে এই সব অঞ্চলে আমার অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। রাইফেলই বেশি ব্যবহার

করতাম—অস্ট্রিয়া থেকে ইমপোর্ট করে আমাকে বাবা উপহার দিয়েছিলেন একটি ম্যানলিকার শুনারের সিঙ্গল ব্যারেল .৩৬৬, ৯.৩ রাইফেল। সেইটি এবং একটি ইংলিশ 'বারো বোরের' দোনলা বন্দুক, ডব্লু ডব্লু গ্রিনার কোম্পানির, ডবল ইজেক্টার, ডবল চোক, বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের। এই দুটিই ছিল আমার প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। এই বন্দুকটিও বাবা ইমপোর্ট করিয়েছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। হেভি বোরের ও লাইট বোরের একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এই দুটিই ছিল আমার 'হাতের অস্ত্র', যেমন সব শিকারিরই থাকে, ক্রিকেটারের 'হাতের ব্যাটে'র বা টেনিস বা র‍্যাকেট প্লেয়ারের হাতের র‍্যাকেটেরই মতো।

পূর্ণিমা রাতের ওই গেন্ডুলিবনের মতো সুন্দর দৃশ্য আমার দেশে খুব বেশি দেখিনি। ওই নৃত্যরতা মসৃণগাত্রর বিবসনা সুন্দরীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যেন পেত্নীতে পেয়েছিল আমাকে। গুণ্ডা হাতি মারা আমাদের হয়নি। আমি ফিরে আসার পরে চাঁদুবাবু বেশ কয়েক মাস পরে তাকে মেরেছিলেন।

আমার প্রায় সব জঙ্গলের বন্ধুরাই আমার চেয়ে অনেক ভাল শিকারি ছিলেন এবং জঙ্গলকেও তাঁরা আমার চেয়ে অনেক ভাল জানতেন। কিন্তু আমি লিখতে পারি বলেই ওঁদের সকলের পরিচিতির চেয়ে আমার পরিচিতি বেশি। এটা আমার কাছে এমবারাসমেন্টের ব্যাপার। তবে এ কথাও ঠিক, পৃথিবীর এবং আমার দেশের নানা জায়গার প্রকৃত ভাল শিকারিদের কাছ থেকে দেখেই বলছি যে, যাঁরা প্রকৃতই ভাল শিকারি, তাঁরা অনেকেই লেখাপড়াই জানেন না, আর যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত মিতভাষী এবং এ ব্যাপারে আলস্যপরায়ণ। তা ছাড়া, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিজের অভিজ্ঞতার কথা সাতকাহন করে বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন—তাঁদের প্রত্যেকেই স্বভাব-বিনয়ী। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত তাঁদের প্রত্যেককেই আমার প্রণাম জানাই।

শিকারিদের মধ্যে এই ব্যাপারে আমার জানা একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত জিম করবেট। রুডইয়ার্ড কিপলিং সাহেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু আমার মতে করবেট ওঁর চেয়ে অনেক বড় লেখক। তার চেয়েও বড়

কথা, জিম করবেট-এর মতো ভারত-প্রেমিক, গরিব-প্রেমিক ভারতে খুব কমই হয়েছেন। অথচ আমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, সেই মানুষটিকে এমনই অপমান করলাম, যে 'My India'-র অশক্ত, বৃদ্ধ লেখককে শেষজীবনে সুদূর কিনিয়াতে গিয়ে মরতে হল। আমরা ঘৃণ্য।

অনেক ভারতীয়, যাঁরা শিকার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কেনেথ অ্যান্ডারসন-এর সঙ্গে জিম করবেট-এর তুলনা করেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অ্যান্ডারসনের বাস ছিল ব্যাঙ্গালোরে। আমার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিকারি বন্ধু কেনেথের স্ত্রী জিন-এর কাছ থেকে যা শুনেছি এবং তার লেখা পড়েও যা মনে হয়েছে তাতে আমারও দৃঢ় ধারণা যে এঁদের দুজনের মধ্যে কোনও তুলনাই হয় না। জিন-এর বাড়ি ছিল বাঙ্গালোরের কাছে হোয়াইট ফিল্ড-এ। অ্যান্ডারসন সেখানেরই বাসিন্দা ছিলেন। হোয়াইটফিল্ড ম্যাকলাস্কিগঞ্জের মতো একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলোনি ছিল। কেনেথ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর মেম্বার থাকাকালীন অবসর নেন। হোয়াইটফিল্ডেই গিয়ে শেষ জীবনে থিতু হন। এখন কেনেথ নেই। বহু বছর জিন-এর খবরও পাই না।

লবঙ্গীর ওই গ্রীষ্মকালের গেণ্ডুলিবনেরই মতো সুন্দর এক বন দেখেছিলাম পালাম্যুতে, কোয়েলের উপত্যকাতে, শীতকালে। বিরাট বিরাট আমলকী গাছে ফল এসেছে তখন, ফলের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে গাছগুলি। সেই আমলকী বনেরই পাশে ছিল সেই সাদা ধবধবে গাছেদের বন। স্থানীয় নাম চিলবিল। তখন 'কোজাগর' লেখার জন্যে কেঁড় বাংলোতে গিয়ে রয়েছি—মারুমার-এও ছিলাম কিছুদিন। 'কোজাগরে'র পটভূমি ভালুমার আসলে মারুমারই, যেমন 'কোয়েলের কাছে'র পটভূমি রুমান্ডি আসলে কুমান্ডি। লিখতে গেলে অনেক ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে হয় প্রয়োজনবশে।

আমার অনুমান গেন্ডুলি এবং চিলবিল এই দুইই আসলে একরকমের SOFT WOOD—সম্ভবত যা কাগজের কলগুলিতে চালান যেত। বটানিস্টরাই বলতে পারবেন।

এইসব প্রসঙ্গ এলেই আমার অ্যামেরিকান কবি এমার্সনের কটি পঙ্‌ক্তি

মনে পড়ে যায়, যে পঙ্‌ক্তিগুলি প্রথম যৌবনের লেখা গল্প 'কুচিলা খাঁই'-তে প্রথমবার ব্যবহার করি এবং তার পরেও বহু লেখাতেই করেছি।

"Bold as the Engineer who fells the wood
Love not the flower they pluck and know it not
And all their botany is Latin names."

কেনেথ অ্যান্ডারসনের কথাতে ফিরে আসি আবার। "I must pay the Devil his dues." অ্যান্ডারসন কিন্তু কথার জাদুকর ছিলেন। ছিলেন বলছি, কারণ আমি জানি না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। ওঁর মতো ভাল শিকারের গল্প-বলিয়ে খুব কমই হয়েছেন। অসাধারণ মুন্সিয়ানা তিনি দেখিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ বইয়ে। অভিজ্ঞতার দাম অবশ্যই আছে কিন্তু সত্যিই অসাধারণ তিনি তাঁর গল্প বলার ঢঙে। এ বাবদে তিনি কিপলিং এবং করবেটকেও অনেক পেছনে ফেলে গেছেন।

চাঁদুবাবু পনেরো-কুড়ি বছর হল জঙ্গলের ছবি আঁকছেন। হাঁপানির কষ্ট আরও বেড়েছে। বয়স এখন পঁচাত্তরের বেশি। নানারকম বৈকল্য এসেছে শরীরে। যে মানুষটি হাসতে হাসতে বন্দুক কাঁধে এক দৌড়ে পাহাড়ের মাথাতে পৌঁছে যেতেন আমার পাশে পাশে আবার এক দৌড়ে নেমেও আসতেন, তিনিই এখন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন। চলাফেরা সবই একটি LUNA মোটরসাইকেলেই সারেন, তাও বাড়ির দরজা থেকে কারও সাহায্যে চড়তে হয়। বছর কয়েক আগে আমি যখন ভুবনেশ্বর বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, তখন ভুবনেশ্বর থেকে কটকে চাঁদুবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমি ভুবনেশ্বরে আসছি শুনে ফুটুদা, এ বি কাকু এবং চাঁদুবাবুও কটক থেকে ভুবনেশ্বরে বইমেলাতে এসেছিলেন। জলরঙ এবং অ্যাক্রিলিকেই বেশি আঁকেন উনি। তবে ছবির চেয়েও বেশি করেন কোলাজের কাজ। নানা ধরনের কাগজ তো বটেই, চামড়ার কোলাজও করেন। চিঠি এবং টেলিফোনের মাধ্যমে জানতে পাই যে তাঁর খুবই নাম হয়েছে চিত্রী হিসেবে ওড়িশাতে এবং নানা পুরস্কারও নাকি পেয়েছেন। তাঁর ছবি দিল্লি এবং অন্য নানা জায়গাতে প্রদর্শিত হয়েছে। ওড়িশার দূরদর্শনের নানা চ্যানেলেও তাঁকে এবং তাঁর ছবি দেখানো হয়েছে এবং প্রায় নিয়মিতই হচ্ছে। জেনে ভাল লাগে। খুবই ভাল লাগে।

এ জীবনে অনেক বীর দেখলাম, অনেক অসাধ্যসাধনকারী, দুর্জয় সাহস ও শারীরিক শক্তির মানুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁদের সকলকেই, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে কোনও না কোনও সময়ে বয়স এবং জরা-কবলিত হতে হয়ই। হেরে যেতে হয়। এই শত্রুকে কোনও বন্দুক-রাইফেল দিয়েই পরাস্ত করা যায় না, পড়ে পড়ে তার হাতের মার খেতে হয়। বসির মিঞা, মধ্যপ্রদেশের এক শিকারি বন্ধু, যিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেকই বড় এবং আজ চলেও গেছেন, একটি কথা বলতেন প্রায়ই। বলতেন, 'জওয়ানি যব আতি হ্যায় তব সাঁতাতি হ্যায়, ঔর যব যাতি হ্যায় তব ঔর ভি জাদা সাঁতাতি হ্যায়।'

যৌবন যে ঈশ্বরের কত বড় দান তা যৌবন যখন থাকে তখন বোঝা যায় না। যৌবন যখন আসে তখন বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে আসে আর যখন যায় তখনও কামড় দিয়ে যায়। যৌবন আসার আনন্দ যেমন পীড়াদায়ক, যৌবন যাওয়ার দুঃখও তেমনই দুঃসহ।

মিস্টার আরেকটু খান এবং এ বি কাকু

চল্লিশের দশকে যখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি তখন থেকেই বাবার সঙ্গে ১ নম্বর চৌরঙ্গির কে সি বিশ্বাস অ্যান্ড কোম্পানিতে যেতাম। বিরাট বন্দুক-রাইফেলের দোকান।

কে সি বিশ্বাস কোম্পানি পরে ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস হয়ে যায়। পারিবারিক অঙ্কটা জানার মতো বড় তখনও আমি হইনি। সেটা সম্ভবত ঘটে পঞ্চাশের দশকে। সেই দোকানের দেখাশোনা করতেন প্রশান্ত বিশ্বাস এবং অনন্ত বিশ্বাস। এই অনন্ত বিশ্বাস, ছোট ভাই-ই, সংক্ষেপে এ বি। সকলেই, তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলে, এমনকি তাঁর নিজের দাদাসুদ্ধু তাঁকে এ বি বলেই ডাকতেন। এই এ বি কাকুই ছিলেন কটকের বিখ্যাত রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ শূরের একজন প্রিয় জামাই। ওড়িশার জঙ্গলে আমার যাওয়ার সূত্র ছিলেন তিনিই।

ওড়িয়াতে জামাইবাবুকে বলে জুঁইবাবু। যদিও এ বি কাকু আমার চেয়ে আট-ন বছরের বড়, ওঁর সঙ্গে ওঁরই সমবয়সী ওঁর বড় সম্বন্ধী ফুটুদা (প্রভাতকুমার শূর) এবং তাঁর জঙ্গলের সঙ্গী চাঁদুবাবুর সঙ্গে আমার অসমবয়সী বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে খুবই ভালবাসতেন এবং ভাল শিকারি হিসেবেও স্বীকৃতি দিতেন। নরেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রীও খুবই স্নেহ করতেন আমাকে।

প্রতি বছর নিলামে জঙ্গল নেওয়া হলেই কটক থেকে ট্রাঙ্ককল আসত এ বি কাকুর কাছে, কোথাকার জঙ্গল—কেমন জঙ্গল, কবে রাস্তা করা শেষ হবে, ক্যাম্প বানানো শেষ হবে আর কবে আমরা যেতে পারি ইত্যাদি তথ্য ও জ্ঞাতব্য দিয়ে। এ বি কাকু সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বলতেন কালই সময় করে

চলে এসো একবার—অনেক কথা আছে। অতএব উত্তেজিত হয়ে চলে যেতাম পরদিনই ডায়েরি পকেটে করে ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস-এর দোকানে, যাওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করতে।

ওঁদের সঙ্গে বাবার কী সম্পর্ক ছিল বলতে পারব না, তবে আমার দৃঢ় ধারণা যত ও যতরকম গুলি ওঁরা আমাদের দিতেন তার একটির জন্যেও টাকা নিতেন না। ভাবখানা এমন, যেন দোকানটি আমাদেরই। আর বন্দুক রাইফেল কি একরকম? এইট বোর ডাকগান থেকে টোয়েন্টি বোর ইংলিশ টলি—লেডিস গান—বাবা বরিশালের সাহেব জজ-এর কাছ থেকে কিনেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর বন্দুক ছিল ওটি, পাখি মারার। সরু সরু মেয়েদের আঙুলের মতো ফিকে গোলাপি ইলি কোম্পানির গুলি আসত বিলেত থেকে। সেই বন্দুক দিয়েই নানা পাখি মেরে বরিশালে আমার শিকারের হাতেখড়ি হয়। তখন আমি ক্লাস ফাইভ-এ পড়ি। রাইফেলও ছিল অনেক। চেকোস্লাভাকিয়ান পয়েন্ট টু-টু থেকে হাতি-মারার ফোর সেভেন্টি ফাইভ ডাবল-ব্যারেল পর্যন্ত। আফ্রিকান হোয়াইট হান্টার জন টেইলর সাহেব (পন্ডোরো) লিখেছিলেন যে ওই বোরের রাইফেল দিয়ে হাতির লেজ-এর গোড়াতে গুলি করলে সেই গুলি সারা শরীর পেরিয়ে গিয়ে হাতির মস্তিষ্কে পৌঁছে হাতিকে ধরাশায়ী করতে পারত। তবে বাবা হাতি শিকারের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। বলতেন, হাতি মারার চেয়ে ঘুঘু মারা কঠিন। তবে গুণ্ডা হাতির কথা আলাদা—চঞ্চল সরকার যেমন হাতি মারেন।

বাবা এবং বাবার বন্ধুবান্ধবেরাও শিকারে গেলে শিকারটা গৌণ থাকত, মুখ্য হত খাওয়াদাওয়া। সুন্দরবনের অথরিটি, রসিকশ্রেষ্ঠ গোপেন্দ্রকিশোর বাগচি, আমাদের মক্কেল এবং বাবার দাদাস্থানীয়। একবার আমাদের সঙ্গে নামনি আসামের সংকোশ নদীর উপত্যকার যমদুয়ারে শিকারে গিয়ে ফিরে আসার সময়ে আমাকে ফিসফিস করে বলেছিলেন (কোনও দুর্বোধ্য কারণে উনি আমাকে 'লালাবাবু' এবং 'আপনি' বলতেন), 'লালাবাবু, এবারে কিছু যাত্রাগান হল—তবে ভারি ভাল জঙ্গল, এখানে একবার শিকারে আসতে হবে, বুঝলেন।' বাবার টিম-এ প্রশান্তকাকু (এ বি কাকুর দাদা) এবং দুর্গাকাকু ছিলেন কোয়ার্টার মাস্টার। সকাল থেকে উঠে কী ব্রেকফাস্ট হবে, দুপুরে কী

দিয়ে কী রান্না হবে এইই ছিল তাঁদের আলোচনার প্রধান বিষয়। আর বাবা ছিলেন যাত্রা দলের অধিকারী। দুপুরের খাওয়া হজম হওয়ার আগেই রাতে কী খাওয়া হবে তা নিয়ে মিটিং বসত। আর খাওয়ার কী পরিমাণ! আজকালকার ডায়েটিসিয়ানরা শুনেই হার্টফেল করবেন।

বাবা মদ খেতেন না এবং মদ খাওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাই নানা বন-বাংলোর বাবুর্চিখানাতে দুর্গাকাকু আর প্রশান্তকাকু ভলান্টিয়ার পাচকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়ে খিচুড়ি রাঁধার অছিলাতে বারংবার গিয়ে সেখানে লুকিয়ে-রাখা বোতল থেকে চুমুক দিয়ে ফিরে আসতেন।

একবার বাগচিবাবুর মোটর লঞ্চে করে (ওঁর লঞ্চ বানাবার কারখানা ছিল, ক্লেব্যাক বোট কোং। সুন্দরবনে ওঁর অনেক লঞ্চ তখন নিয়মিত চলত) সুন্দরবনে শিকারে গেছি। আমাদের সঙ্গে কেনেথ জনসনও গেছেন। তখন কেনেথ পশ্চিমবঙ্গের একনম্বর আয়কর কমিশনার। তখন চিফ-কমিশনারের পোস্ট ছিল না—এক নম্বরই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড ছিলেন। প্রশান্তকাকু সকালে ও রাতে জনসন সাহেবকে খাওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড পীড়াপীড়ি করতেন আর বলতেন : 'প্লিজ! আর একটু খান, আর একটু।' কলকাতায় ফেরার দুদিন পরে ওঁর ঘরে গেছি, উনি বললেন, মাই গুডনেস! 'দ্যা সিনিয়র বিসওয়াস ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান দ্যা সুন্দরবন টাইগার। প্লিজ টেল হিম দ্যাট আই হ্যাভ নেমড হিম 'মিস্টার আরেকটু খান।'

এ বি কাকুরও নানা বিশেষত্ব ছিল। ছ ফিট লম্বা, গৌরবর্ণ, সুদর্শন মানুষটি সব সময়ে তাঁতের ধুতি পরতেন মোটা পাড়ের। ঊর্ধ্বাঙ্গে ফুল-শার্ট কিন্তু দু-হাতেরই হাত গোটানো থাকত। ওঁদের একটি ক্যামেরার দোকানও ছিল চৌরঙ্গিতেই। সে দোকানের সামনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এক গোরা সৈন্য ওঁকে 'ব্লাডি ইন্ডিয়ান' বলাতে তাকে এক ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। ওই দোকানের দৌলতে সেই চল্লিশের দশকেই রোলিফেক্স, রোলিকর্ড, কনটাক্স ইত্যাদি ক্যামেরার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। জার্মান রোলিফ্লেক্স-এর দুরকম লেন্স আসত। 'জেনার' আর 'টেসার'। সেই সময় থেকেই বন্দুক রাইফেলের দিকে বেশি না ঝুঁকে যদি ক্যামেরার দিকে ঝুঁকতাম তবে আজ লাভ হত অনেক বেশি। এরকম অনেকবারই হয়েছে।

পালামৌ-এর মুগুর জঙ্গলে একবার মাচাতে বসে আছি, দিনের বেলা, হাঁকোয়ার শেষে হাঁকোয়াওয়ালাদের পায়ে পায়ে লেপার্ড বেরিয়েছে, যেমন বাঘ ও লেপার্ডের অভ্যেস। বড় বড় লাফ মেরে সে এগিয়ে আসছে। আমার ঠিক সামনেই একটি বড় গাছ এবং তার নিচ দিয়ে গেম-ট্রাকটি দু-ভাগ হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দু-দিকে চলে গেছে। আমার সামনে রিভিয়েরা এইট মিমি মুভি ক্যামেরা, ডানদিকে লোডেড ৩৬৬ সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল এবং বাঁদিকে দোনলা বারো বোরের বন্দুক মাচার ওপরে শোয়ানো আছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্যামেরাতে হাত না দিয়ে রাইফেলই তুলে নিয়ে গুলি করেছি। লেপার্ড আহত হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পাশের ঝাঁটি জঙ্গলে ভরা টিলাতে দৌড়ে উঠে গেছে। হাঁকোয়া শেষে সেই আহত লেপার্ডকে অনুসরণ করে মারা সে যে কী হ্যাপা এবং বিপজ্জনক হ্যাপা তা বলার নয়। যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন। আরেকবার হয়েছিল সুন্দরবনে। বাগচিবাবু আগেই বলে রেখেছিলেন যে এখন যে খালে ঢুকছি তাতে একটি বিরাট কুমির দেখা যাবে। সেই কুমির প্রায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো বড় ছিল। তাকে বাবা গুলি করেন এবং মিস করেন। কিন্তু আমার হাতে মুভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও ছবি তোলা হয়নি।

যা বলতে চাইছিলাম, সেই প্রথম যৌবন থেকে বন্দুকধারী না হয়ে ক্যামেরাধারী হলে হয়ত অনেকই ভাল হত। কিছুদিন আগে ওয়াইল্ড-লাইফ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পৃথিবী বিখ্যাত ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফার ড. নরেশ বেদির সঙ্গে এই আলোচনাই হচ্ছিল। ক্যামেরা দিয়ে ওঁরা, মানে উনি, ওঁর ভাই, ওঁর ছেলে ও বেলিন্ডা রাইট যে সব কবিতা লেখেন, সে সব কবিতা বারবার পড়ে বা দেখেও পুরনো হয় না।

এ বি কাকু তাঁর ছেলেবেলাতে যখন গাড়ি চালাতে শিখেছিলেন, সম্ভবত ত্রিশের দশকের গোড়ায়, তখন শিখেছিলেন খালি পায়ে। তারপর সারাজীবন উনি নগ্নপদ না হয়ে গাড়ি চালাতে পারতেন না। পায়ের পাম্প-শুটি খুলে অ্যাকসিলারেটর এবং ক্লাচে পা রেখে গাড়ি চালাতেন। তাঁর আরেকটি ট্রেড-মার্ক ছিল গাড়ি চালাতে চালাতে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের সিটে-বসা যাত্রীর সঙ্গে সমানে কথা বলে যেতেন। তখন কলকাতা যে কী সুখের শহর

ছিল তা আর কী বলব! আজকের দিনে এ বি কাকুর ড্রাইভিং-এর মতো সর্বনাশা ড্রাইভিং-এর কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

জঙ্গলে গিয়ে এ বি কাকু তাঁর দাদা প্রশান্তকাকু ওরফে 'মিস্টার আরেকটু খান'-এর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতেন। সঙ্গে থাকতেন বড় সম্বন্ধী ফুটুদা। সকাল থেকে শালা-ভগ্নীপতি মিলে ব্রেকফাস্টে কী মেনু হবে তাই ঠিক করতেন। ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতে দুপুরবেলাতে কী হবে না-হবে তার আলোচনাতে বসতেন। জঙ্গলে প্রথম রাত বিশ্রাম নেওয়ার পর থেকেই কিছু না কিছু বড়-ছোট জানোয়ার ও পাখ-পাখালি শিকার তো হতই। বসন্তের শেষে গেলে জঙ্গলের 'পনস' অর্থাৎ এঁচড় তো থাকতই।

শুয়োর, কোটরা হরিণ বা বার্কি ডিয়ার বা গুরান্টি বা মাউস ডিয়ার বা খরগোশ বা শজারু মারা হলে তা দিয়ে চাঁদুবাবু বা বিমলবাবুর সুপারভিশনে ক্যাম্পফায়ারের মধ্যে ডবা বাঁশের একদিক ফুটো করে তার মধ্যে মাংসর টুকরো এবং মাংস রান্নার মশলার সঙ্গে মিশিয়ে ফুটো-করা মুখটি কাদা দিয়ে বন্ধ করে আগুনে ফেলে দেওয়া হত। মাঝে মাঝে বারবিকিউ-এর মতো নেড়েচেড়ে দিতে হত। তারপর এক সময়ে ফট্ শব্দ করেই সেই বাঁশ ফেটে গেলে তা আগুন থেকে বের করে ফাটিয়ে প্লেটে সেই কাবাব ঢেলে নুন দিয়ে খেতে হত। নুন আগে দিলে কিন্তু সব পণ্ড। কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া হত সম্ভবত নুন দিলে। জঙ্গলের সেই 'নলাপোড়ার' স্বাদ মুখে এখনও লেগে আছে। যদিও নলাপোড়া করা শিখেছিলাম ওড়িশার জঙ্গলেই কিন্তু ভাল বাঁশ পাওয়া গেলে অন্যান্য জঙ্গলেও নলাপোড়া করেছি এবং অন্যদেরও করতে শিখিয়েছি। এখন বহু মানুষে নলাপোড়া খেয়ে থাকেন। শহরের মটন এবং পর্ক দিয়েও নলা-পোড়া হয়। তবে শহরে ওইরকম মোটা বাঁশ পাওয়া যায় না বলেই মোটা বাঁশ যেখানে পাওয়া যায় তেমন জঙ্গলে যেতে হয়।

বিমলবাবু, বিমল ঘোষ ছিলেন ফুটুবাবুদের ম্যানেজার। ছোট্টখাট্ট রোগা পাতলা কালো-কোলো মানুষটি। কিন্তু একজন আশ্চর্য মানুষ। তাঁর কথা পরে বলব আলাদা করে।

এ বি কাকু বা ফুটুদা শিকারে খুব উৎসাহী ছিলেন না কোনওদিনই। তবে আমাদের কখনও নিরুৎসাহ করতেন না। এবং শিকার আমরা করতে পারলে খুশি হতেন। শিকারি বলতে চাঁদুবাবু ও আমি। ওঁরা বলতেন, আমরা তোমাদের ধুয়ো ধরতে আসি। আমি বলতাম, আপনারা ধুয়াধার।

পুরুনাকোটে যে রোগ বাইসনটিকে আমি মেরেছিলাম, তার শিঙের জন্যে বনবিভাগের সঙ্গে মামলা করে সেই শিং আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন ফুটুদার বাবা নরেনবাবু।

এ বি কাকুর দৌলতে যেমন ওড়িশার অনেক জঙ্গলে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, এ বি কাকুকে ও চাঁদুবাবুকেও আমিও কিছু জংলি জায়গাতে নিয়ে গেছি। যেমন পালামৌ, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, মণিপুরের ইম্ফল, বার্মার (এখন মিয়ানমার) প্রথম গ্রাম তামু। এ অঞ্চলের সেগুন গাছের গুণমান বার্মার পৃথিবী-বিখ্যাত সেগুনের মতোই ছিল। ভারতের শেষ গ্রাম 'মোরে', বার্মা সীমান্তে। মণিপুর ছাড়াও ন্যাগাল্যান্ডের কোহিমা, ডিমাপুর এবং আসামের কাজিরাঙ্গা এবং শিলং।

যখন আমরা ইম্ফল থেকে কোহিমাতে যাই গাড়িতে আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পথ ধরে তখন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মিস্টার হোক্কেকে সেমা। তিনি কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মসের খরিদ্দার ছিলেন। নিয়মিত বন্দুক রাইফেল ও গুলি কিনতেন। অধিকাংশ পাহাড়ি মানুষই শিকার-প্রিয় হন দেখেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে এ বি কাকু ফোন করতেই তিনি পরদিন আমাদের সকলকে ব্রেকফাস্টে ডাকলেন তাঁর বাড়িতে। তখন নাগা পাহাড়ে খুবই সন্ত্রাস চলছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। রাতে আমরা এম এল এ হস্টেলে ছিলাম। পরদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ব্রেকফাস্ট করে ডিমাপুরের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারিই ফোন করে আমাদের জন্যে ফরেস্ট বাংলো বুক করেছিলেন। ডিমাপুরের সেই বাংলোতে একজন বদরপুরী মুসলমান বাবুর্চি ছিল। বহুদিন আগের কথা, তার নাম ভুলে গেছি। দারুণ বাবুর্চি। যেরকম নানা কন্টিনেন্টাল পদ রান্না করত সে, আর তেমনই সুইট ডিশ। আমরা দিন তিনেক ছিলাম ওই বাংলোতে।

লালজি

নামনি আসামের ধুবড়ি শহর থেকে কয়েকমাইল দূরত্বেই গৌরীপুর। গৌরীপুরের জমিদারদের রাজা আখ্যা ছিল। বাংলার চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার নাম আপনারা সকলেই জানেন। প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন ছোট রাজকুমার। তাঁর নামই লালজি। ছোট্টখাট্ট মানুষটি—অসাধারণ রসবোধসম্পন্ন। প্রথম যৌবনে অসাধারণ শিকারিও ছিলেন। বন্দুক রাইফেল এবং পিস্তলে তাঁর 'হাতের' জন্যে আজও তিনি কিংবদন্তি হয়ে আছেন ওই অঞ্চলে। ওঁর দিদি বড় রাজকুমারীও মাত্র তেরো বছর বয়সে প্রথম বাঘ মারেন।

বড়ুয়া পরিবারে হাতির এক বিশেষ স্থান ছিল। যাঁরা প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিটি দেখেছেন তাঁদের সেই পাহাড়প্রমাণ হাতিটির কথা মনে থাকতে পারে। তার নাম ছিল সম্ভবত জংবাহাদুর। দুরারোগ্য অ্যানথ্রাক্স রোগে সে মারা যাওয়ার পরে গৌরীপুরের রাজাদের বাসস্থান মাটিরাবাগ প্যালেস-এ তাকে কবর দেওয়া হয়। রাজবাড়িটি এখনও আছে। একটি টিলার ওপরে।

শিকারি হিসেবে নয়, হাতি-বিশেষজ্ঞ হিসেবে লালজি সারা পৃথিবীতে পরিচিত ছিলেন। দু'ভাবে বুনো হাতি ধরা হয় আমাদের দেশে। এক 'খেদা', আরেক 'মেলা'। মধ্যযৌবন থেকেই লালজির পেশা ছিল বনবিভাগ থেকে অনুমতি নিয়ে হাতি ধরে সেই হাতি বিভিন্ন রাজা, মহারাজা, জমিদার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে বিক্রি করা। শেষ জীবনে যখন হাতি-ধরা বেআইনি হয়ে যায় তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে বুনো হাতি গ্রামগঞ্জে ঢুকে উৎপাত শুরু করলে তাদের তাড়ানোরও দায়িত্ব নিতেন। তিনি তো

বটেই তাঁর কন্যা পার্বতী বড়ুয়াও এই বিশেষ কাজে দক্ষ। এবং উনিও বনবিভাগের এই কাজে শামিল হন প্রয়োজন হলেই।

শোনপুরের মেলায়, যা ভারতের নানা বড়-ছোট প্রাণীর সবচেয়ে বড় বাৎসরিক মেলা—যেখানে সারা ভারত থেকে মানুষ হাতি বেচা-কেনা করতে আসতেন, সেই মেলাতে লালজির মতামতই ছিল শেষ কথা হাতির ব্যাপারে। লালজিকে সকলে 'বাবা' বলে ডাকত সেখানে। হাতির পায়ের নখ দেখে বাবা বলে দিতেন কোন হাতি সুলক্ষণা। হাতির দাঁত, শুঁড় ও লেজ দেখেও বলতে পারতেন। একদাঁতি 'গণেশ'-এর মধ্যে কার স্বভাব কেমন হবে তাও বলতে পারতেন।

ওঁকে আমি প্রথম দেখি আমার বারো বছর বয়সে। প্রিয়নাথ মুখার্জি তখন আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার আয়কর কমিশনার ছিলেন। তখন খাসি ও জয়ন্তীয়া হিলসও আসামের অধীনেই ছিল। লালজি যমদুয়ারের কাছে রাঙ্গানদীর পাশে হাতি ধরার ক্যাম্প করে 'খেদা' করে হাতি ধরছিলেন তখন। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে। বাবা এইট মিমি মুভি ক্যামেরাতে বুনো হাতি পোষমানানো, তাদের দৌড় করানো, নানা আদেশে রপ্ত করার নানা প্রক্রিয়ার রঙিন ছবি তুলে রেখেছিলেন।

পরবর্তী জীবনে লালজির অনেক স্নেহ ও সম্মান পেয়েছিল এই অধম। তিনি আমার লেখার খুবই ভক্ত ছিলেন এবং বারবার সে কথা নানা চিঠিতে প্রকাশও করেছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল যে তাঁকে নিয়ে আমি একটি বই লিখি। এ প্রসঙ্গে ওঁর লেখা একটি চিঠি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত আমার 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে' বইয়ের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃতও করেছি। উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগে যেখানে গরুমারা অভয়ারণ্য, তার কাছেই মূর্তিনদীর ওপরে বনবিভাগ অতি চমৎকার বনবাংলো ও গাছ-বাড়ি বানিয়েছেন সাম্প্রতিক অতীতে। সেই মূর্তি ব্লকের এক ফরেস্টার বা রেঞ্জারের কোয়ার্টারে তাঁর দুটি হাতি নিয়ে থাকছিলেন একসময়ে লালজি বনবিভাগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। শিলিগুড়িতে কাজে গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে শুধুমাত্র ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই অনেক খুঁজে খুঁজে মূর্তিতে গিয়ে এক শীতের বিকেলে পৌঁছেছিলাম। সেদিন মূর্তি বস্তিতে হাট

ছিল। উনি হাট করছিলেন। 'রাজা'কে খুঁজছি শুনে হাটুরেরাই তাঁকে দূর থেকে দেখিয়ে দিল। একটি হাতে-সেলাই-করা কাপড়ের থলি গলা থেকে পেটের ওপরে ঝোলানো, খাকি প্যান্টের সঙ্গে ইস্ত্রিবিহীন খাকি শার্ট এবং পায়ে বাটা কোম্পানির সস্তাতম লাল কেডস পরে রাজা যখন হাসিমুখে এলেন গাড়ির সামনে, আমার আরণ্যক-এর রাজা দোবরু পান্নার কথা মনে হয়েছিল।

বড়ই দুঃখের কথা এই যে, এইরকম একজন মানুষ যোগ্য প্রচার পেলেন না। উনি প্রায় বারো-তেরোটি আদিবাসী ভাষা বলতে পারতেন তাদেরই মতো করে। শুনেছি, যে-জঙ্গলেই ক্যাম্প করে যখন থাকতেন সেখানের কোনও আদিবাসী তরুণীকে সঙ্গিনী করতেন। প্রকৃতি আর যুবতী নারী যাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী ছিল তাঁর তো কোনওদিনই বুড়ো হওয়ার কথা নয়। বুড়ো বলতে আমরা যা বুঝি তা কখনও হনওনি। রসবোধও ছিল প্রচণ্ড। মূর্তিতে ওঁর জন্যে রাম নিয়ে গিয়েছিলাম। রাম আর ডিম ভাজা খেতে খেতে অনেকক্ষণ গল্প হল। আমার রাতেই শিলিগুড়ি ফেরার ছিল, পরদিন বাগডোগরা থেকে প্লেন ধরার জন্যে। উনি বললেন, নবকান্ত বড়ুয়া একবার আইস্যা কইল,—রাজা, আপনারে ইলেকশনের টিকিট দিমু, আপনার মন্ত্রী হওন লাগে। তাতে উনি বলেছিলেন, আমি রাজা, কোন দুঃখে মন্ত্রী হইতে যাম্?

জানি না, অতবড় একজন গুণী ও মানী মানুষ ওঁর চেয়ে বয়সে তো বটেই, সবদিক দিয়েই ছোট আমার মতো একজন নগণ্য মানুষকে কেন 'গুহসাহেব' বলে ডাকতেন। ওঁর চলে যাওয়ার কিছুদিন আগে আমার অফিসে এসে যমুনাদেবীর ছেলেকে একটি কাজ দেওয়ার অনুরোধ জানান। আমার ভাই বিশ্বজিৎ এবং অন্য অংশীদারেরাই এখন অফিসের কাজ দেখেন। ভাইকে বলাতে সে তাকে আমাদের অফিসেই একটি যৎসামান্য কাজে বহাল করে। সে আজও আমাদের কাছেই আছে। এই আমার এক বিশেষ আনন্দ।

লালজির মতো মানুষের স্নেহ এবং আশ্চর্য শ্রদ্ধা এবং বনের রাজার কাছ থেকে আমার বনজঙ্গলের লেখার উদার প্রশংসা যে পেয়েছি তা আমার জীবনের মস্ত বড় পাওয়া। যাঁরা বনে-জঙ্গলেই সারাজীবন কাটিয়েছেন, বন ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে যাঁদের অজানা কিছুই নেই তাঁদের প্রশংসার দামই

আলাদা। বড় বড় সাহিত্য পুরস্কার নাই-ই বা পেলাম এ জীবনে—পাঠক-পাঠিকাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই আমার শিরোধার্য।

দুঃখ হয় একটা কথা ভাবলে যে দেশে এত ফিল্ম ডিরেক্টর, এত ওয়াইল্ড-লাইফ রাইটার এবং ফোটোগ্রাফার তাঁদের মধ্যে একজনও লালজির মতো মানুষকে নিয়ে একটি বই লিখলেন না, ডকুমেন্টারি ছবি করলেন না। আজকে তো মাথা খুঁড়লেও আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। যখন উনি ওঁকে নিয়ে লিখতে বলতেন তখন আমার পেশাতে আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম যে সারা ভারতে চরকির মতো ঘুরতে হত—তাই সম্ভব ছিল না। তবে একটিমাত্র বই লেখা হয়েছে লালজির উপরে। পুলিশের অবসর প্রাপ্ত ডি. আই. জি. শ্রী পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য "হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর" লিখেছিলেন লালজির সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়ে। বইটি ভাল বই। তবে লালজির ধারণা ছিল যে ওঁকে নিয়ে আমি লিখলে বইটি আরও ভাল হতে পারত। আমি অবশ্য সে কথা মানিনা। বইটি যথেষ্টই ভাল বই।

শেষ করার আগে বলি যে, লালজির দিদি প্রতিমা বড়ুয়াও আসামের বিখ্যাত গায়িকা। এবং তাঁর গোয়ালপারিয়া গান—হস্তীকন্যার গানগুলি সারা দেশেই বিখ্যাত। ওঁরও খুব ইচ্ছে ছিল যে ওঁকে নিয়ে আমি একটি বই লিখি। বেশ কয়েক বছর আগে যখন ধুবড়ি বইমেলা উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম তখন উনি আমাকে গৌরীপুরে তলব করেছিলেন। ওঁর কাছে যাওয়াতে ওই অনুরোধই করেছিলেন দু-হাত ধরে। কিন্তু আগেই বলেছি, আমি তো অন্য পেশার মানুষ। ফাঁকিবাজিতে যেহেতু বিশ্বাস করি না, কোনও কাজ হাতে নিয়ে তা ভালভাবে করতে না পারলে সে কাজে আমি হাতই দিতে চাই না। কোনও গুণী ও বিখ্যাত মানুষের জীবনী লিখতে হলে যে সময় এবং যে লাগাতার মনোযোগ সেই কাজে দেওয়া প্রয়োজন, সেই সময় আমার হাতে ছিল না। সেই দুঃখ আমারই রইল। প্রতিমা বড়ুয়াও গত হয়েছেন কিছুদিন হল।

হাতিই ছিল বড়ুয়া পরিবারের সুখ এবং দুঃখও। বড় রাজকুমারীর ছেলে মুণীন্দ্র বড়ুয়াকেও আমি চিনতাম। আমার পৈতৃক নিবাসের কাছেই বাড়ি করেছিলেন ওঁরা। মুণীনবাবুও হাতি শিকার করতে গিয়ে এক রাতেরবেলা হাতির তাড়া খেয়ে আলু-খোঁড়া গর্তে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পান।

বাকি জীবন তাঁকে শয্যাশায়ীই থাকতে হয়। এ খবরও আমি লালজির কাছেই পাই।

লালজির মেয়ে পার্বতী উত্তরবঙ্গেই বাড়ি করে থিতু হয়েছে। মাদারিহাটের সামনের হাইওয়ে থেকে পার্বতীর বাড়ি দেখা যায়। পথের বাঁদিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে পার্বতীও ভাল গান গায়, হস্তীকন্যার গান। তার সঙ্গে দু বছর আগে আমার প্রথম দেখা হল 'আরণ্যক' আয়োজিত ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে সঞ্জয় বুধিয়ার দেওয়া একটি পার্টিতে। বেঙ্গল ক্লাবে। পার্বতীর কাছেই শুনলাম যে আমি যখন মূর্তিতে লালজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন ও-ও ছিল সেই বাংলোতে। আমি দুর্জন বলেই হয়ত লালজি আমার সঙ্গে তাঁর সুন্দরী কন্যার মোলাকাত করাননি।

আমার সঙ্গে শিলিগুড়ির একজন ব্যবসাদার ছিলেন যিনি লালজির সম্পূর্ণই অপরিচিত, হয়ত সেই জন্যেই করাননি।

কেনেথ এডওয়ার্ড জনসন

কেন জনসনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ষাটের দশকের গোড়াতে—নামনি আসামের ধুবড়ির সার্কিট হাউসে। তখন জনসন আসামের আয়কর কমিশনার। পুঞ্জিভূত অনাদায়ী আয়কর SCALING DOWN করতে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সের মেম্বার কোদন্ডরমন সাহেব দিল্লি থেকে শিলঙে গিয়েছিলেন। কলকাতার মুখ্য কমিশনার তখন ছিলেন এফ এইচ ভল্লিভয় সাহেব। ছ ফিট দু ইঞ্চি লম্বা, মুম্বইয়ের ভোরা মুসলমান। গল্ফ খেলেন, হুইস্কি খান। লোকে বলত 'গে ব্যাচেলর'। তখন GAY শব্দটির মানে অন্য ছিল। তিনিও গিয়েছিলেন। কোদন্ডরমন দিল্লি ফিরে গেলে জনসন আর ভল্লিভয় সাহেব ভুটিয়া অফিসার ডি ওয়াংডি সাহেবের গাড়িতে করে শিলং থেকে এসে ধুবড়ি সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন। আমাদের মক্কেল ধুবড়ির টাউন স্টোর্সের শচীন রায় মশায় যমদুয়ারে বাংলো বুক করেছিলেন এবং শিকারের অন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বহুল ব্যবহৃত আমেরিকান অল-পারপাজ ড্যাকোটা প্লেনে করে জ্যামেয়ার কোম্পানির দয়াতে কলকাতা থেকে যুদ্ধের সময়েই আমেরিকানদের বানানো 'রূপসী' এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে টাউন হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। পরদিন সকালেই যাত্রা। গৌরীপুর-তামাহাট-বরবাধা-কচুগাঁও রাইমানা হয়ে যমদুয়ারের উদ্দেশে। আমি বিকেলে ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেছি সার্কিট হাউসে। ওয়াংডি কাকু আমাদের সঙ্গে আগেও শিকারে গেছেন। ক্যাপ্টেন জনসন যেমন আর্মি থেকে আয়কর দপ্তরে এসেছিলেন তেমনই এয়ারফোর্সের পাইলট ডি ওয়াংডিও এসেছিলেন। ওয়াংডি কাকুই বাবাকে বারবার চিঠি লিখেছিলেন

শিলং থেকে, জনসন সাহেবের জন্যে বাঘ শিকারের বন্দোবস্ত করতে। তাই বাবার অনুরোধেই শচীনবাবু সব বন্দোবস্ত করেছিলেন। টাইম-বারিং অ্যাসেসমেন্টের নানা ঝামেলা থাকাতে নিজে আসতে না পেরে বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সার্কিট হাউসে গিয়ে দেখি ওঁরা স্কচ হুইস্কি খাচ্ছেন এবং তাস খেলছেন। স্কচ-হুইস্কি কথাটাতে অনেকেরই অবশ্য আপত্তি আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জির নানা গুণে গুণান্বিত পুত্র কুমারপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের কুমারদা বলতেন হুইস্কি আবার স্কচ ছাড়া হয় নাকি? ততক্ষণে সান-ডাউন হয়ে গেছে। বাবা বলতেন, শিকারের সব ভাল শুধু মদ আর মেয়েমানুষ বাদে। "আমি ওসব খাই না" বলাতে ভল্লিভয় বললেন, 'উ্য ডোন্ট ড্রিঙ্ক, দেন হোয়াই ড্যু উ্য লিভ ফর?' সবিনয়ে ওঁকে বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য! আই হ্যাভ আদার রিজনস্ ফর লিভিং।'

তাসও খেলব কি? বাবার কড়া শাসনে তাস চিনতাম না পর্যন্ত। তখন আমার বয়স উনত্রিশ। একবার স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন রঙ মেলানো খেলা শিখেছিলাম। তাও বহুদিন আগেই ভুলে গিয়েছিলাম। বাবা বলতেন, তাস, পাশা, দাবা, লুডো এসব একদম খেলবে না। খেলতে হলে ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট এসব খেলবে। তাই...।

আমাদের সঙ্গে আবু সাত্তারও যাচ্ছে। সাত্তারের সঙ্গে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই এ অঞ্চলে অনেক শিকার করেছি। তামাহাট ও সংলগ্ন অঞ্চলে। আমাকে 'লালদা' বলত ও। এমনিতে সে লুঙি পরত। আর খাকি হাফশার্ট। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে যাচ্ছে, তাই সেবারে খাকি প্যান্ট পরেছে। সাইকেলের সঙ্গে তার আটাশ ইঞ্চি দোনলা বন্দুকটি বাঁধা থাকত। কখনও কখনও পিঠেও ঝোলানো থাকত স্লিঙে। প্রচণ্ড সাহসী ছিল সাত্তার। তার চোয়ালে দৃঢ়প্রত্যয় আঁকা ছিল। মুখে সব সময়ে পান আর গুয়া—মানে, মজা সুপুরি। তার কথা অনেকই আছে আমার 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে'র প্রথম খণ্ডতে।

সাত্তারের জীবনের শেষ পরিণতিটা বড় করুণ। ভীষণই বদরাগী ছিল সে। বাঘ ও চিতার আক্রমণে আহত হয়ে সে একাধিকবার যমের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে। ওর নিবাস ছিল ধুবড়ি শহরের কাছেই। জমিজমা নিয়ে পারিবারিক

বিবাদে সে দিশাহারা হয়ে একই দিনে তার এগারোজন আত্মীয়কে গুলি করে মেরে ফেলে তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে। আবু সাত্তার জঙ্গলের রহস্য বুঝত, জানত, জানোয়ারদের চিনত কিন্তু মানুষকে চিনত না। তাই মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা সে সহ্য করতে পারেনি। ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ধুবড়ির কোর্টে। গুয়াহাটি হাইকোর্টে আপিল করেছিল। তখন আমাকে একটা পোস্টকার্ড লিখেছিল আর্থিক সাহায্য চেয়ে। আমার সাধ্যমতো পাঠিয়েওছিলাম। কিন্তু ফাঁসির আদেশ রদ হয়নি। তার ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল।

যমদুয়ারের জঙ্গল ছিল দেখার মতো। অত বড় বড় শাল ও সেগুন খুব কম বনেই দেখেছি, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কোনও কোনও বনে ছাড়া। সিংভূমের সারান্ডার (ল্যান্ড অফ সেভেন হান্ড্রেড হিলস) শালবন বিখ্যাত, মণিপুরের বার্মা সীমান্তের সেগুনও বিখ্যাত কিন্তু সংকোশ নদীর অববাহিকার যে শাল-সেগুন তার সঙ্গে তুলনীয় কম গাছই দেখেছি।

যমদুয়ারের দোতলা বনবাংলোটি (আসাম এবং উত্তরবঙ্গের প্রায় সব বনবাংলোই শালের খুঁটির ওপরেই হয়, দোতলা, হাতির ভয়ে) একেবারে সংকোশ নদীর ওপরেই ছিল। শুনেছি, এখন সে বাংলোটি আর নেই। বক্সার ভুটানঘাট বাংলোরই মতো। অনেকই বছর যমদুয়ারে যাইনি। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা স্বচ্ছতোয়া সংকোশ নদীতে মাছও পাওয়া যেত। জল এতই স্বচ্ছ ছিল যে জলের মধ্যে মাছেদের ঝাঁক দেখা যেত। শীতের দিনে পৃথিবীর নানা দেশের পরিযায়ী হাঁসেরাও আসত সেখানে। নদীর এক পারে ভুটান, অন্য পারে আসাম এবং তার গায়েই পশ্চিমবঙ্গ। যমদুয়ারের এমনই খ্যাতি ছিল যে ভুটানের মহারাজা ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে সোজা থিম্পু থেকে হেলিকপ্টারে এসে নামতেন বাংলোর সামনের হাতাতে শিকারের জন্যে। থাকতেন অবশ্য নিজস্ব তাঁবুতে। কখনও-বা ওই বাংলোতেও থাকতেন।

আমরা বাঘের খোঁজ পাওয়ার জন্যে পরদিন আর্লি-ব্রেকফাস্ট করেই সাত্তারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জিপে। ভল্লিভয় গেলেন না। মাইল তিরিশ দূরে রাঙ্গা নামের একটি বিস্তীর্ণ নদী ছিল, তখন শুকনো। যেখানে লালজির হাতি-ধরার ক্যাম্পের কথা আগেই বলেছি। সেই নদীর বুকে সাত্তারের সন্ধানী চোখ থাবার দাগ খুঁজে পেল। রাঙ্গার একটি শাখানদী পেরিয়ে

ডানদিকের জঙ্গলে গেছে বাঘ। সেখানেই সে দিনের বিশ্রাম নেয়। রাঙ্গার বাঁদিকে নীলাভ হিমালয়। তার পদপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত ঘাসবন। সেখানে একটি দহ ছিল। যখন তাতে ভরা জল ছিল তখন হাতি, বুনো মোষ, গাউর, গণ্ডার এবং নানা জানোয়ার wallowing করত। সেই সব জানোয়ারের গায়ের লোম ওই দহর চারপাশের গাছে কাদার সঙ্গে তখনও লেগেছিল। হাতিদের পায়ের চাপে কাদার মধ্যে যে গর্ত হয়েছিল তা তখন শুকিয়ে হামনদিস্তার মতো হয়ে থেকে গিয়েছিল। তার ওপরে লতা লতিয়ে থাকাতে যে কোনও সময়ে অসাবধানীর গোড়ালি ভাঙতে পারত। সেই দহতে সামান্য জল তখনও ছিল। বাঘ সেই ঘোলাজল খেতে আসত। ওই নোংরা জলের পাশের কাদাতেই বাঘের থাবার দাগ দেখা গেল।

অত বড় শাল গাছে মাচা বাঁধা অসম্ভব। প্রথম ডালের উচ্চতাই প্রায় দু মানুষ হবে। তাছাড়া, মাচা বাঁধার সাজসরঞ্জাম ও জনবলও আমাদের ছিল না। তাই বাংলোতে ফিরে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে আবার ওইখানে এসে ওই শাখানদীর দুটি প্রান্তে আমরা দু দলে ভাগ হয়ে মাটিতেই আড়াল নিয়ে বসব ঠিক করলাম।

বলতে ভুলে গেছি, অত বড় দুজন আমলা এসেছেন, যাঁরা দুজনেই যথাসময়ে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেসের মেম্বার তো বটেই চেয়ারম্যানও হবেন, তাই ধুবড়ির ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার নীতিরঞ্জন ভট্টাচার্য, (যিনি পরে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কলকাতা থেকে অবসর নেন) গোপালের ভাষায়, 'এক গাছা' বন্দুক নিয়ে শামিল হয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি কখনও বকও মারেননি। সরকারি চাকরি করতে গেলে যে সময়ে সময়ে প্রাণও বন্ধক রাখতে হয় তা পরেও বহুবার দেখেছি।

লাঞ্চের সময়ে ভল্লিভয় সাহেব বললেন, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। আই হ্যাভ মাই স্কচ অ্যান্ড আগাথা ক্রিস্টি। অতএব লাঞ্চের পরে আমরা ভল্লিভয় সাহেবকে রেখেই গেলাম। তারপরে এবং তার পরের দিন কী হল তার সবিস্তার বর্ণনা আছে 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারের' প্রথম খণ্ডে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করব না।

শিলঙে ফিরে Ken জনসন আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। যমদুয়ারের বন্ধুত্ব পরে গভীর ও চিরস্থায়ী হয়েছিল এবং কেন ও জিন

জনসনের মতো ভদ্র, সৎ এবং সম্ভ্রান্ত বন্ধু আয়কর বিভাগের অগণ্য তাবড় তাবড় আমলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেও বলতে পারি যে, বেশি পাইনি। জনসনদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের রকমের কথা বলতে গেলে আলাদা বই লিখতে হয়।

সেই চিঠির শেষে Ken লিখেছিলেন, ইংরেজি হরফে, কিন্তু হিন্দি ভাষায়, 'ক্যা বদনসীবী হামারা, শের আয়া নেহি মারা।'

Ken জনসন পরে কলকাতার মুখ্য কমিশনার হয়ে আসেন। কয়েক বছর পরে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেসের মেম্বার হয়ে দিল্লি চলে যান। ওঁরই চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নির্বাচনের আগে ইন্দিরা গান্ধীর একজন অন্যরকম মানুষের দরকার ছিল চেয়ারম্যান হিসেবে তাই ওঁকে মেম্বার হয়েই অবসর নিতে হয়। দিল্লিতে মেম্বার থাকার সময়ে তো প্রায়ই দেখা হত দিল্লিতে, এবং অবসর নেওয়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত আমাদের চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। উনি চলে গেছেন। খুবই শূন্যতা বোধ করি।

জনসন, ডঃ বোস এবং দুর্গা রায়

জনসন আর কিরণকাকুকে নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে এই স্মৃতিচারণ সম্পূর্ণ হবে না। কিরণকাকু মানে, ড. কিরণ বোস বা ডক বোস। জ্যোতি বসুর নিজের বড় দাদা। ড. কিরণ বোস এবং তাঁর স্ত্রী জলপাইগুড়ির রায়কত রাজ-এর রাজকুমারী প্রতিভা দেবী এবং রাজকুমারীর সব জামাইই আমাদের মক্কেল ছিলেন। ছোট জামাই IFB-র বিজন নাগ অবশ্য সুইৎজারল্যান্ড থেকে ফিরে IFB প্রতিষ্ঠা করার আগে অবধি মক্কেল ছিল। আমিই বিজনকে এস আর বাটলিবয়ের অমল সি চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়েছিলাম।

শিলিগুড়ির দুর্গা রায়ের সঙ্গে জনসন সাহেবের আলাপ আমাদেরই মাধ্যমে। দুর্গাকাকুর কথা পরে বলব আলাদা করে। উনি একবার আমাকে অন্ধকারে রেখে জনসন আর কিরণকাকুকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে গেছিলেন শিকার করাবার জন্যে। কিরণকাকুর নাম ডক বোস ছিল কারণ ওঁর অত্যন্ত অবস্থাপন্ন বাবা ওঁকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন দাঁতের ডাক্তার হওয়ার জন্যে আর জ্যোতিবাবুকে পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে। ব্যারিস্টারি পাশ করতে মেধা লাগে না তাই বড়লোকের ছেলেরা সহজেই ব্যারিস্টার হতেন এবং পরে অধিকাংশই ব্রিফলেস ব্যারিস্টার হতেন। জ্যোতিবাবু আমাদের নেহরু সাহেবেরই মতো কোনও দিনই প্র্যাকটিস করেননি। করলে, মেধার পরিচয় পাওয়া যেত। স্টেটস থেকে দাঁতের ডাক্তার হয়ে ফিরে আসেন দাদা। দাঁত তুলে কিরণকাকুর আর কতই বা রোজগার হত? তার বদলে একটি রাজকুমারী তুলে তিনি বিনা মেহনতে কোটিপতি হয়ে গেলেন। সারা জীবন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আর স্কচ হুইস্কির সঙ্গ

করে দিব্যি জীবন যাপন করে গেলেন। মানুষটা কিন্তু ছিলেন চমৎকার। সোজা-সাপটা।

কিরণকাকু দারুণ ইলিশ মাছ রাঁধতেন। জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে আমাকে নিজে হাতে যে ইলিশ মাছ রেঁধে খাইয়েছিলেন তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। রাজকুমারী প্রতিভা দেবীও আমাকে সন্তান স্নেহেই দেখতেন। তবে ডঃ বোস বা কিরণকাকু শিকারি আদৌ ছিলেন না এবং ওঁদের অ্যাকাউন্ট্যান্টের মুখে শুনেছি, ওঁর বিয়ের পরে রাজ এস্টেটের খাসমহল—বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে উনি এমন বেধড়ক গুলি চালিয়ে মাদী হরিণ মেরেছিলেন যে রাজা প্রসন্নদেব রায়কত তাঁর একমাত্র জামাইয়ের ওপরে অত্যন্তই অপ্রসন্ন হয়েছিলেন।

এক ভাই প্র্যাকটিস না-করা দাঁতের ডাক্তার আর অন্য ভাই প্র্যাকটিস না-করা ব্যারিস্টার। তবে কিরণকাকু সহজ-সরল মানুষ ছিলেন আর তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিবাবু ঝানু রাজনীতিক। তিরানব্বই বছর পার করেও রাজনীতির মধুবন ছেড়ে বানপ্রস্থে যেতে নারাজ।

দুর্গাকাকু চিরদিনই ধনী-সঙ্গে কাটিয়েছেন। শুনেছি, নাটোরের মহারাজের বাড়িতেও নাকি থাকতেন এক সময়ে। তবে কোন দাবিতে তা ঠিক জানি না। নানা জনের কাছে নানা মানুষে নানা কথা বলেন। অনেক বছর উনি দক্ষিণ কলকাতার রায়কত রাজাদের বাড়ি শরৎ ব্যানার্জি রোডের জলপাইগুড়ি হাউসেই থাকতেন। তার পরে কিছুদিন আমাদের পৈতৃক নিবাস, রাজা বসন্ত রায় রোডের 'কনীনিকা'তে। তারও পরে বেঙ্গল ল্যাম্পের গেস্ট হাউসে।

দুর্গাকাকুর তখন হিলকার্ট রোডে, প্রায় সুকনার কাছে একটি খামারবাড়ি ছিল শালবাড়িতে। একটি হাতিও ছিল। খামারে চাষ-বাসও হত। পুকুর ছিল। সিলভার কার্প ও তেলাপিয়া মাছের চাষও হত। দুর্গাকাকুর চোরাশিকারি হিসেবে বেশ বদনাম ছিল উত্তরবঙ্গে। আর ব্যক্তিগত বৈরিতা ছিল বিখ্যাত, কৃতী, সৎ, এবং সর্বার্থে পরিশীলিত বনপাল কনক লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে।

দুর্গাকাকু তো ফ্লাইটে জনসন ও কিরণকাকুকে নিয়ে বাগডোগরা পৌঁছে সেই সন্ধেতেই তাঁর হাতির পিঠে মোটরগাড়ির ড্রাইসেল ব্যাটারি, স্পটলাইট এবং জনসন সাহেব ও কিরণকাকুকে চড়িয়ে দিয়ে স্বহস্তে রান্না করতে লেগে গেলেন। হুইস্কির গ্লাসটাস সাজিয়ে ডিনারের জন্যে একেবারে রেডি।

এদিকে হাতি তো বৈকুণ্ঠপুরের সুগভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল সন্ধের পরে। সেই জঙ্গলই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-এর জঙ্গল। সন্ন্যাসীকাটা হাটের লাগোয়া একটি চা-বাগানও ছিল রাজকুমারীর। সেই বাগানেও থেকেছি একবার।

কিছুদূর যাওয়ার পরেই স্পটলাইটের আলোতে একটি মস্ত বড় শিঙাল দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে, তৃণভূমিতে। জনসন সাহেব গুলি করলেন এবং সেই শিঙাল পড়ে গেল হয়ত রাজার জামাইয়ের প্রতি আনুগত্য দেখাতেই। শিঙাল তো মরে ধন্য করল কিন্তু তাকে কী প্রকারে শালবাড়ির খামারে নিয়ে যাওয়া যায়? কিরণকাকুর আদেশে হাতিকে বসানো হল। জনসন সাহেব বললেন, দড়াদড়ি দিয়ে ভাল করে শিঙালকে বাঁধো। তারপর বললেন, ডক বোস, ইউ গেট ডাউন অ্যান্ড পুশ ফ্রম বিলো অ্যান্ড মাইসেল্ফ অ্যান্ড দ্যা মাহুত উইল পুল ইট আপ অন দি এলিফ্যান্ট'স ব্যাক।

পরিকল্পনা ঠিকমতোই এগোচ্ছিল, কিরণকাকু মাটিতে নেমে প্রাণপণে ঠেলছিলেন এবং মাহুত এবং জনসন সাহেব মৃত শিঙালকে আরও প্রাণপণে উর্দ্ধপানে আকর্ষণ করছিলেন।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক বিপত্তি। মৃত হরিণের শিংয়ের ছুঁচোল মুখ 'অচানক' হাতির শুধু পুরুষ হাতিরই নয়, সব পুরুষেরই একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রত্যঙ্গ থাকে তাতে আঘাত করামাত্র হাতি বিনা বাক্যব্যয়ে এবং রায়কত রাজার একমাত্র জামাই বা বঙ্গভূমের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একমাত্র দাদা বলে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ না করে মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে সোজা শালবাড়ির ক্যাম্প বলে দৌড়।

জনসন সাহেব ও মাহুত হাতির পিঠের ওপরে শুয়ে পড়ে ডালপালার আঘাত থেকে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে শালবাড়িতে ফিরলেন।

দুর্গাকাকু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, হোয়্যার ইজ ডক বোস?

জনসন সাহেব মাথা নিচু করে বললেন, হি ইজ লেফট ইন দ্যা জাংগল।

তখন তো শিকার মাথায় উঠল। গারাজ থেকে জিপ বের করে হাতির পিঠ থেকে স্পটলাইট নামিয়ে জিপের বনেটের নিচে ব্যাটারির সঙ্গে ক্ল্যাম্পে লাগিয়ে জিপ নিয়ে ডক বোসকে খোঁজার জন্যে দুর্গাকাকু স-জনসন বেরিয়ে পড়লেন। মাহুতও সঙ্গে গেল জায়গাটা চেনাতে।

ওইদিকে নেপথ্যে কী ঘটছিল তার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক আপনাদের। কিরণকাকুর হাতে ছিল একটি .৩৭৫ ডাবল-ব্যারেল ইংলিশ হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডের রাইফেল। রাইফেলটি এতটাই ভাল যে যিনি তা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন তাঁর পক্ষে বাঘ বা গাউর এমনকি হাতি মারাও কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু রাইফেল বন্দুক কিরণকাকু বহুযুগ ব্যবহার করেননি। মাঝে একবার বাবার সঙ্গে ওড়িশাতে গিয়ে হয়ত গুলি ছুঁড়েছিলেন দু-একটা। তবে যতদূর শুনেছিলাম আমার দু ভাইয়ের কাছে যে কিরণকাকু অথবা দুর্গাকাকু কারোও রাইফেল-নিঃসৃত গুলির সঙ্গেই কোনো জানোয়ারের শরীরের কেনো অংশেরই যোগাযোগ হয়নি।

যেখানে শিকার অর্থাৎ মৃত শিঙাল এবং ওঁকে ফেলে রেখে হাতি বিদ্যুৎগতিতে দৌড় লাগিয়েছিল সেটা গভীর বনের মাঝে একটি তৃণভূমি। বেশ কিছুটা জায়গাতে পরিষ্কার নজর চলে। কিরণকাকু ভয়ঙ্কর ভয়ে ভীত না হয়ে ওই ফাঁকা জায়গাতেই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন ওই রাইফেলকে সঙ্গী করে। ভূত-প্রেত হলে অন্য কথা ছিল, কোনও প্রাণীকে ভয় করার কোনও ন্যায্য কারণ তার ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে উনি ভাবলেন, মাটিতে না থেকে একটা গাছে চড়া দরকার। কিন্তু গাছে শেষবার চড়েছিলেন বহুযুগ আগে সেই শৈশবাবস্থায়। কিন্তু কালক্ষেপ করার সময় কোথায়? উনি একটি মাঝারি মাপের গাছে হান্টিং-বুট পরে চড়তে গিয়ে হাত পাঁচেক ওপরে উঠেই পপাতঃ ধরনীতলে। মেরুদণ্ডে লাগল বেজায় চোট। তাতে ভয় তাঁকে আরও গলা টিপে ধরল।

দুর্গাকাকু তখন জঙ্গলময়, জিপের ও স্পটলাইটের আলোর বন্যা বইয়ে ছুটোছুটি করছেন আর মুখে হরিনামের মতো আকুল স্বরে কিরণ! কিরণ! করে ডাক ছাড়ছেন। কিন্তু কীসের কিরণ? কোথায় কিরণ?

হঠাৎ একটি চিঁচিঁ চিৎকার শোনা গেল একটি গাছের ওপর থেকে, এঁই যেঁ। আঁমি এঁকাঁনে।

আলো ফেলতেই দেখা গেল মাটি থেকে দু-হাত ওপরে দু-পা দিয়ে একটি গাছের কাণ্ড জড়িয়ে কিরণকাকু আধো শোয়া হয়ে আছেন।

এতসব যে ঘটে গেছে তা আমার জানা ছিল না কারণ দুর্গাকাকু পুরো

ব্যাপারটাই ঘটিয়েছিলেন আমাকে ঘুণাক্ষরে না জানিয়ে। পরদিনই ফ্লাইটে জনসন ও কিরণকাকু কলকাতা ফেরেন। কিরণকাকু সোজা উডল্যান্ডস-এ গিয়ে ভর্তি হয়ে যান।

তার তিনদিন পর আমাকে জনসন সাহেব ফোন করেন। উত্তেজিত গলাতে জিজ্ঞেস করেন, আর উ্য বিজি?

হোয়াই?

ক্যুড উ্য প্লিজ কাম ওভার ফর ফাইভ মিনিটস?

আয়কর ভবন থেকে আমার অফিসে ঢিল মারলেই পড়ে। তাই গেলাম। দেখলাম, ব্যাজার মুখে জনসন বসে বসে পাইপ খাচ্ছেন। আমি ঢুকেই বললাম, হোয়াটস আপ?

কথা না বলে, উনি একটি চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খোলা চিঠি। মনে হল, একটু আগেই খোলা হয়েছে। চিঠিটি তুলে নিয়ে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস কনকেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর অফিসিয়াল প্যাডে লেখা চিঠি। লিখেছেন : 'আই হ্যাভ কাম টু নো ফ্রম রিলায়েবল সোর্সেস দ্যাট উ্য হ্যাড বিন টু দ্যা বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট অ্যান্ড শট আ স্ট্যাগ অন সানডে লাস্ট অ্যারাউন্ড সেভেন পি. এম.। উ্য ডিডনট হ্যাভ আ পারমিট আইদার। প্লিজ এক্সপ্লেইন ইওর কনডাক্ট।

আমি তো চিঠি পড়ে থ।

জনসন সাহেব তারপর বললেন পুরো ঘটনা। বললেন, 'দিস ব্লাডি চ্যাপ, ডক বোস, হি গেভ দ্যা ম্যাটার সাচ আ হেল অফ আ লট অফ পাবলিসিটি দ্যাট দ্যা হোল অফ ক্যালকাটা নো বাউট দি ইনসিডেন্ট।'

আমি বললাম, চিঠিটা নিয়ে এখন কী করবেন? জবাব দেবেন কী?

জনসন সাহেব বললেন, 'মাই ফুট। হোয়াট দ্যা হেল ক্যান আই ড্যু উইথ ইট? হোয়াট রিপ্লাই? মাই ফুট। আই উইল পুট দ্যা লেটার ইন মাই পাইপ অ্যান্ড স্মোক ইট অফফ্।'

শুধু দুর্গাকাকুই নন, আমার বন্ধু গোপালও এই রকমই আমাকে ঘুণাক্ষরে না জানিয়ে জনসন সাহেবকে নিয়ে আসানসোলের নর্থব্রুক কলিয়ারির আমাদের অনুজপ্রতিম প্রণব রায়ের সঙ্গে পরেশনাথ পাহাড়ের নিচে তোপচাঁচি লেকের পারের জঙ্গলের গভীরে একটি কেঁদ গাছে পাঁঠা বেঁধে

জিপেই বসেছিল। অন্ধকারের একটু পরেই একটি চিতা এসে পাঁঠার ঘাড় মটকায়। প্রণব টর্চ ফেলে এবং জনসন সাহেব ঘোড়া দাবেন। বাঘ জনসন সাহেবকে ওবলাইজ করে লক্ষ্মী ছেলের মতো নরকে যায়।

ওই ঘটনার কথাও জনসন সাহেব কলকাতায় ফিরেই আমাকে জানান। কারণ, দুর্গাকাকু বা গোপাল সকলেরই আলাপ হয় জনসন সাহেবের সঙ্গে আমারই মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, সেই শনিবারই জনসন সাহেব গোপাল ও আমাকে ওঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একতলা ভাড়া বাড়িতে সেই লেপার্ড মারা সেলিব্রেট করার জন্যে নেমন্তন্ন করেন। প্রণব আসেনি, অবশ্য ও কলকাতাতে ছিল কি না জানি না। সেই পার্টিতেই কেনেথের বড় ভাই লেসলির সঙ্গে আলাপ হয়। লেসলি জনসন আই সি এস ছিলেন এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমভীরা সাহেবের ব্যাচমেট ছিলেন। উঠেও ছিলেন কলকাতাতে রাজভবনেই। লেসলি তখন ও এন জি সি-র চেয়ারম্যান। দু-ভাইয়ের চেহারাতে কোনও মিল ছিল না। কেনেথকে দেখে বোঝা যেত যে তিনি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, কিন্তু লেসলির চেহারা ছিল একেবারে সাদা সাহেবেরই মতো।

ডক বোস এবং জনসন সাহেবের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে 'কেলো' করার কয়েকমাস পরে কালাহান্ডিতে শিকারে যাওয়ার কথা হয়। Ken জনসন, তাঁর এক স্কটসম্যান বন্ধু Jim ক্যালান, দুর্গাকাকু আর আমি যাব ঠিক হয়। জিম তখন কলকাতার ব্রিটিশ হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি ছিলেন। হৃষ্টপুষ্ট, হাসিখুশি স্কটসম্যান, পানীয়র ওপরেই থাকতেন। তবে স্কটল্যান্ড বা ইংল্যান্ডে একটি শিয়ালও মারেননি তিনি। নিজের বন্দুক-রাইফেল পর্যন্ত নেই অথচ ইন্ডিয়াতে বিগ-গেম শিকার করার খুবই শখ।

জনসন সাহেবের অনুরোধে বাবার একটি অর্ডিনারি .৩৭৫ সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল নিয়েছিলাম জিমের জন্যে। সেই রাইফেলের গ্রুভস প্রায় অবশিষ্ট ছিল না। ব্যারেল প্রায় জলের কল হয়ে গিয়েছিল। শিকারি অনুযায়ী আদর্শ অস্ত্র। আমি নিয়েছিলাম একটি ফোর সেভেন্টি ফাইভ ডাবল ব্যারেল রাইফেল—উত্তরবঙ্গের কমিশনার আইভান সুরিটা (পিয়ার্সনের ভাই) ওটি আমাকে প্রায় জলের দামেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি এ দিয়ে অনেকই শিকার করেছি, কিন্তু এখন আর এই চোদ্দো পাউন্ডের রাইফেল

ব্যবহার করতে পারি না। বাট আই ক্যানট গিভ দিস টু এনি টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি।

এই রাইফেলটিই আমাকে 'নগ্ন-নির্জন' উপন্যাসটি লিখতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু সে অন্য গল্প।

দুর্গাকাকু একদিন ফোন করলেন আমাকে। তখন আমাদের বাড়িতে আর থাকেন না—বেঙ্গল ল্যাম্পের গেস্ট হাউসেই থাকেন। তপন রায়, বেঙ্গল ল্যাম্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আগে উত্তরবঙ্গের এক সাহেবি চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন। সেই সময় থেকেই দুর্গাকাকুর সঙ্গে আলাপ। বেঙ্গল ল্যাম্পও আমাদের মক্কেল ছিল।

ফোন করে দুর্গাকাকু বললেন, কিরণ খুব ধরেছে সে আমাদের সঙ্গে কালাহান্ডিতে যাবে। আমি সেই মতো জনসনকে বলেওছিলাম। কিন্তু জনসন রাজি নন। তুমি একবার বলে দেখো না। তোমার বন্ধু।

আমি আয়কর ভবনে গিয়ে অনুরোধ করলাম জনসন সাহেবকে। পাইপ ভরতে ভরতে ভুরু কুঁচকে উনি বললেন, হু?

বললাম, ডক বোস।

জনসন সাহেব বৈকুণ্ঠপুরের ব্যাপারে এতই ক্ষেপে ছিলেন যে বললেন, ওঁকে গিয়ে বোলো যে, একটি শর্তে ওঁকে সঙ্গে নিতে পারি।

কী শর্তে?

"I will tie him up as a bait for the tiger. If he is agreeable he can come along." বলাই বাহুল্য, কিরণকাকুর যাওয়া হয়নি।

কালাহান্ডিতে অবশ্য জনসন সাহেব একটি বাঘ মেরেছিলেন। কালাহান্ডির বাঘেদেরও সুন্দরবনের বাঘেদের মতো মানুষখেকোর বদনাম ছিল। বদনাম যে মিথ্যে নয়, তা আমরা নিজ চোখে দেখেওছি। এই জঙ্গলেই আহত বাঘকে গুলি করে মাচা থেকে নেমে বিখ্যাত ব্যারিস্টার এবং 'ঝিলে জঙ্গলে'র লেখক শিকারি কুমুদনাথ চৌধুরি বাঘের হাতে নিহত হন, অথচ তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখাতে বারবার করে নিষেধ করেছিলেন সব শিকারিকেই, বাঘকে গুলি করে মাচা থেকে না নামতে।

কালাহান্ডির প্রাকৃতিক পরিবেশ ওড়িশার এবং আমাদের দেশের অন্য অনেক জায়গার সঙ্গেই মেলে না। আফ্রিকা আফ্রিকা গন্ধ আছে একটু।

বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক বিস্তার করে বলতে হয়। কালাহান্ডিতে দেখেছি বাঘের জন্যে যে Bait দেওয়া হয়, সে যে জানোয়ারই হোক না কেন, তাকেও একটি ছোট মাচার ওপরে রাখা হয়। অমনটি পৃথিবীর আর কোথাওই দেখিনি।

কালাহান্ডির বনের মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, যে সব মানুষ মানুষখেকো বাঘেদের পেটে যায়, তারা একরকমের ভূত হয়ে যায়। সেই ভূতেদের নাম 'বাঘ্বডুম্বা'। তারা ছোট ছোট পাখির রূপ ধরে থাকে ও রাতের বেলা নিজেরা গাছের ডালের ঝুপড়ির আড়ালে অদৃশ্য থেকে ডাকে: 'কিরি-কিরি-কিরি-কিরি-ধূপ্-ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ। 'নগ্ন-নির্জন' উপন্যাসে বাঘ্বডুম্বার কথা আছে। ওড়িশার বাঘ্বমুণ্ডার পটভূমিতে লেখা উপন্যাস।

জনসনের সঙ্গে অনেক জায়গার জঙ্গলেই গেছি শিকারে—সুন্দরবনে, আসামে, ওড়িশার কালাহান্ডিতে, কিন্তু বাঘ ওঁর হাতে মারা পড়ে একমাত্র কালাহান্ডিতেই— অন্য জায়গাতে আমাদেরই মারা পড়ার কথা ছিল—এখনও বেঁচে যে আছি, এ আশ্চর্যের ব্যাপার। জনসন সাহেব বাঘ দেখলেই ভীষণই ঘাবড়ে যেতেন। বাঘের এমনই ব্যক্তিত্ব যে, বাঘের সামনাসামনি হলে, বিশেষ করে পায়ে হেঁটে, তখন যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়তে চায় শরীর। মেসমেরাইজড করে দেয় বাঘ মানুষকে। তাই ভয় পাওয়াটা আশ্চর্যের কথা নয়, কিন্তু যাঁরা বাঘকে মারতে চান, তাঁদের তো অন্যদের মতো হলে চলে না। আজকালকার অভয়ারণ্যের 'পোষা' বাঘ তো ছিল না সেই সব বাঘ। স্বাভাবিক বাঘেদের চালচলনই ছিল অন্যরকম।

তবে জনসনের কালাহান্ডির বাঘের চামড়াটা উদ্ধার করা যায়নি। পরদিনই ভাইজাগ থেকে ট্রেন ধরার ছিল আমাদের। স্ট্র-প্রোডাক্টসের রায়গড়ার গেস্ট হাউসে রাত কাটিয়ে আমরা ভাইজাগের দিকে বেরিয়ে পড়ি। আহত বাঘের খোঁজ করার ভার দিয়ে আসি রামচন্দ্র দণ্ডসেনা নামক এক পেশাদার শিকারিকে। সে আবার জনসন সাহেবের দাদা লেসলি জনসনের অধীনে পেশাদার শিকারি হিসেবে কাজ করেছিল যখন লেসলি দণ্ডকারণ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন।

বাঘটা পেটে রাইফেলের গুলি খেয়ে নিজের গুহার দিকে চলে যেতে চেয়েছিল। মানুষসুদ্ধ, সব প্রাণীই যেমন নিজের জায়গাতে গিয়েই মরতে

চায়। কিন্তু অনেক রক্তপাত হওয়াতে বেচারি গুহামুখের সামনে একটি মস্ত বড় চ্যাটাল কালো পাথরের ওপরে শুয়ে পড়েছিল, গুহাতে আর ঢুকতে পারেনি। দণ্ডসেনা রক্তের দাগ অনুসরণ করে দলবল নিয়ে হাঁকা করে যখন সেখানে পৌঁছেছিল, তখন বেলা প্রায় আটটা। তার আগেই শকুনরা ছিঁড়েখুঁড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছিল। গায়ের চামড়া বলতে কিছু ছিল না।

ক্রিসমাসের আগে আগে, জনসন সাহেব তখন বম্বেতে গেছেন। জনসন সাহেবের পাঞ্জাবি পি এ, এ এল সুড আমার কাছে একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এলেন। তাতে লেখা—"CARCASS FOUND IN FRONT OF THE CAVE, CONGRATULATIONS." টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন আর্য ভৌমিক সাহেব, বেহরামপুর গঞ্জামের অ্যাপেলেট অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। আমি সঙ্গে সঙ্গে জনসনের বম্বের ঠিকানাতে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিই—ফোন নম্বার জানা ছিল না। জিন জনসন তারপরে বহু বছর পর্যন্ত আমাকে বলত, 'দ্যা নাইসেস্ট ক্রিসমাস গিফট উই এভার হ্যাভ ওজ ইওর টেলিগ্রাম, লালা।'

মহম্মদ নাজিম, হাজারিবাগী

গোপালের সঙ্গে প্রথমবারে হাজারিবাগে গেছি ইন্টারমিডিয়েট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্সির পরীক্ষা দিয়ে। বর্ষাকাল। সারারাত থার্ড ক্লাসে জেগে এসেছি, তারপর শেষ রাতে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে বাসে উঠে পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভেঙেছে টাটিঝারিয়াতে বাস এসে দাঁড়ালে। হাজারিবাগ রোড স্টেশন বা সারিয়া থেকে বগোদর হয়ে বিষুনগড় হয়ে বাস পৌঁছবে হাজারিবাগ শহরে, কোররার মোড় পেরিয়ে।

টাটিঝারিয়ার পণ্ডিতের দোকানের চা, কালাজামুন আর নিমকি খেয়ে ততক্ষণ রোদ উঠে-যাওয়া পথ বেয়ে হাজারিবাগে পৌঁছে দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটালাম। সন্ধের মুখে মুখে একটি সাইকেল রিকশা নিয়ে সার্কিট হাউসের সামনের পথ দিয়ে কাছারির মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করে বড়া মসজিদের সামনের অপ্রশস্ত গলিতে এক মুসলমানের জুতো আর মুঙ্গেরি বন্দুকের দোকানের সামনে রিকশা থেকে নামলাম।

গোপাল আলাপ করিয়ে দিল, নাজিম সাহেব। মহম্মদ নাজিম। চেয়ে দেখলাম, একজন রোগাসোগা খুবই লম্বা অত্যন্ত কুদর্শন মানুষ। মাথার আকৃতিটাও আশ্চর্য। বড় বড় দাঁত, সর্বক্ষণ কালি-পিলি জর্দা দেওয়া পান আর সিগারেট খেয়ে খেয়ে মুখের অদ্ভুত ছিরি হয়েছে। মানুষটির চোখ দুটি অতুলনীয়। পৃথিবীতে আর কারও অমন চোখ ছিল কি না, জানি না। কথা শোনা বা বলার সময়ে চোখ দুটি ক্রমাগত গাড়ির হেডলাইটের মতো ডিপার-ডিমার হতো। উত্তেজিত হলে বা বিস্মিত হলে ডিপার আর এমনি অবস্থাতে ডিমার।

স্বল্পক্ষণ আমার হিন্দি শুনেই বললেন, খাতা মে নাম উঠ গ্যয়া। যব তক

ঠিকঠাক হিন্দি বোলি নেহি বোলনে পাইয়েগা তবতক নাম নেহি কাট্টা যায়েগা। নাজিম সাহেবের মৃত্যু অবধিও কাটা যায়নি নাম।

ইতিমধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি এল আর সেই বৃষ্টি মাথায় করে এক দেহাতি যুবক দোকানে এসে ঢুকল কাকভেজা হয়ে। বলল, হাওয়াইয়ান চপ্পল দেখান।

তখন সবে ওই চপ্পলগুলো এসেছে কলকাতা এবং অন্যত্রর বাজারে।

নাজিম সাহেব তাকে আদর করে বসিয়ে চা পান খাইয়ে মিনিট দশেক পুটুর পুটুর করে কথা বলার পরে তাকে একজোড়া মোষের চামড়ার নাগরা, লোহার নাল লাগানো, বিক্রি করলেন। ছেলেটি চলে গেলে টাকা ক্যাশবাক্সে তুলে রেখে বললেন, অব বেলিয়ে।

আমি বললাম, গ্রাহক চাইল হাওয়াইয়ান চপ্পল আর আপনি তাকে বেচলেন মোষের চামড়ার নাগরা! মুনাফা বেশি ছিল বুঝি?

নাজিম সাহেব বললেন, বিলকুল নেহি। হাওয়াই চপ্পলমে তিন রুপিয়া জাদা মুনাফা থা।

তব? আমি বললাম।

নাজিম সাহেব আমাকে দাবড়ে বললেন, তব কা? গাহক আকর মাঙ্গেকা আম ঔর উসকো বিকেগা ইমলি, তবহি না ম্যায় দুকানদার হুঁ।

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, মতলব?

নাজিম সাহেব বললেন, গাহক কো ক্যা পাতা হ্যায় কওন চিজ উনকো চাহিয়ে। তারপর বললেন, ওকে হাওয়াইয়ান চপ্পল বিক্রি করলে ও যখন সেই চপ্পল পরে বাস থেকে নেমে কাদা ভরা তিন মাইল কাঁচা পথ জঙ্গলে হেঁটে তার গ্রামের বাড়িতে যাবে তখন তার চপ্পল কাদায় গেঁথে পথেই রয়ে যাবে, হয়ত স্ট্র্যাপও ছিঁড়ে যাবে, তারপর খালি পায়ে, বাড়ি পৌঁছে গাল পাড়বে নাজিম মিঞাকে। কিন্তু যে জুতো ওকে আমি দিলাম সে জুতো কমসে কম দু-বছর পাহাড়ে-জঙ্গলে পরে ছিঁড়ে ফেলার পরে আবার নাজিম মিঞার দোকানেই জুতো কিনতে আসবে।

আমি ভাবলাম, এই মানুষকে হায়দরাবাদের ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট 'বেলা-ভিস্তাতে' মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির ওপরে বক্তৃতা করতে নিয়ে যাওয়া উচিত। অনেক বড় বড় মার্কেটিংয়ের গুরুও এই সহজ দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারেন।

ওঁর দোকানের সামনে দিয়ে কোনও মোটর গাড়ি গেলেই (পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি হাজারিবাগ শহরে গণ্ডা গণ্ডা মোটর গাড়ি ছিল না, কলকাতায়ই ছিল না।) উনি হাত তুলে সেলাম করছেন দেখলাম।

কওন থা?

আমি শুধোলাম।

কওন জানে!

তব?

তব ক্যা? গাড়িমে যব যা রহা হ্যায় জরুর কোঈ না কোঈ ভারী আদমি হোগা। কোঈ ভারী অফসর নেহি ত কোঈ পয়সাওয়ালা আদমি। আমি রোজই তাঁর গাড়ি দেখে তাঁকে না চিনেই সেলাম ঠুকব তো, উনি ভাববেন আমি নিশ্চয়ই তাঁকে চিনি। আর তিনি যদি নেহাত কামিনা না হন তবে নিজের বা পরিবারের জুতো কিনতে আমার দোকানে অবশ্যই আসবেন।

নাজিম সাহেব ইংরেজি জানতেন না তবে উর্দু জানতেন ভালই। তাঁর মুখে শায়েরির ফোয়ারা ফিট করা ছিল। তবে ইংরেজি না জানলেও আমাকে ইংরেজিতেই চিঠি লিখতেন একটা ঘটনা পর্যন্ত। একবার চিঠি লিখলেন মাই 'ওল্ডেস্ট' সান হ্যাজ ডায়েড। ওঁর এল্ডেস্ট সান-এর নাম ছিল আজ্জু মহম্মদ। হাসি-খুশি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে, হিন্দি সিনেমার হিরোর মতো হাবভাব। আমাদের সঙ্গে বহুবার শিকারে গেছে। সে মরে গেছে শুনে নাজিম সাহেবকে টেলিগ্রামে সান্ত্বনা জানালাম—'মে হিজ সউল রেস্ট ইন পিস' ইত্যাদি লিখে। তারপর পাঁচদিন পরই গোপালের সঙ্গে ফোনে কথা হল। গোপাল বলল, শুনেছ লালসাহেব, নাজিম মিঞার এগারো নাম্বার ছেলেটা মারা গেছে।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, বলো কি?

তখুনি আবার টেলিগ্রাম করে কনডোলেন্স রিভার্স করলাম।

এই ঘটনার পর থেকে নাজিম সাহেব ইংরেজি হরফে কিন্তু উর্দুমিশ্রিত হিন্দিতে চিঠি লিখতেন। প্রতি চিঠির শেষে লেখা থাকত 'ফাদার মাদারকো দোয়া'।

নাজিম সাহেবের কাছ থেকে অনেকই শিখেছি। বনজঙ্গল সম্বন্ধে, শিকারের ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে, জীবনবোধ সম্বন্ধে।

আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয় তখন এবং তার অনেকদিন পর পর্যন্ত উনি সাইকেল আরোহীই ছিলেন। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে করে বিরিয়ানি, পায়া, চাঁব এবং নানারকম কাবাব নিয়ে আসতেন 'পূর্বাচল'-এ। তখন তাঁর বাড়ি আমাদের নেমন্তন্ন করার যোগ্য ছিল না নাকি। পরে যখন নাজিম সাহেব বড়লোক হলেন, একাধিক গাড়ি ছিল, আজ্জু মহম্মদ হাজারিবাগ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিল, যখনই আমরা একসঙ্গে জিপ বা গাড়িতে যেতাম তখনই রাতের বেলা উল্টোদিক থেকে আসা সাইক্লিস্টকে দেখেই আমাদের বলতেন, হেড লাইট ডিমার কিজিয়ে উও বিচারি নাল্লিমে গিড় পড়েগা।

আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, গরিব থেকে বড়লোক হওয়ার পরে অধিকাংশ বড়লোকদের মধ্যেই তার গরীবীর স্মৃতি থাকে না—হয়ত তাঁরা তা ইচ্ছে করেই মুছে দেন। কিন্তু যাঁরা ভাগ্যবান নন তাঁদের প্রতি এই সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত মনোভাব বহু বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখিনি। অর্থ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে অমানুষ করে।

একবার কুসুমভা গ্রামের কাছে হাঁকোয়া হচ্ছে। কাড়ুয়ার খবর ছিল যে একটি বাঘ এসে ঢুকেছে ওই জঙ্গলে পানুয়ান্না টাঁড় থেকে। তাই মস্ত বড় হাঁকোয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। প্রায় শ'দেড়েক মানুষ, টাঙ্গি আর তীরধনুক, নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে টানা পাঁচঘণ্টা ধরে হাঁকোয়া করল। আমি, গোপাল, নাজিম সাহেব, আমাদের বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জি, হাজারিবাগের পূর্বতন এস পি সাহেবের বড় ছেলে, তার ভাই মুকুল, শামীম মিঞা, টুটিলাওয়ার জমিদার আমাদের বিশেষ পরিচিত ইজাহারুল হক প্রমুখ অনেকেই ছিলেন। অত লোকের শ্রম বৃথা গেল, ধৈর্য ব্যর্থ হল। আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। বাঘ তো দূরস্থান, আশ্চর্যের কথা, একটি ঘুঘু পর্যন্ত বেরুল না হাঁকাতে। অথচ কুসুমভার পেছনের জঙ্গল পাখি আর জানোয়ারে বোঝাই ছিল।

নাজিম সাহেব হাসছিলেন। বললেন, এও এক শিক্ষা লালাবাবু। কখনও কখনও গভর্নরের শিকারেও এমনই হয়। একটি পাণ্ডুক পর্যন্ত বের হয় না। পাণ্ডুক মানে ঘুঘু। আমি আজ ফজিরের নামাজ না পড়ে এসেছি। আপনাদেরও হয়ত কোনও না কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। উপরওয়ালা খুশি নন।

নাজিম সাহেবের কথা শুনে আমার বাবার কথা মনে হয়েছিল। বাবা সব সময় বলতেন FAILURES ARE THE PILLERS OF SUCCESS। কখনও ভগ্নহৃদয় হবে না। জীবনে কখনও পেছন ফিরে তাকাবে না। সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংয়েও বলতেন, NEVER REGRET A THING YOU HAVE DONE।

হাজারিবাগের অনতিদূরে বানাদাগ বস্তি থেকে হাঁটাপথে মাইল তিনেক গিয়ে কুসুমভা নামের একটি বস্তি ছিল। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ওই পথেই হাজারিবাগ-চাতরার রুটে বাসের কন্ডাক্টর ছিলেন এক সময়ে। এক রাতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঘের বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়ে তিনি পুষেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন বিলি। বিলি বড় হওয়ার পর তাকে বাড়িতে রাখার নানা অসুবিধে হওয়ায় উনি আর ওঁর এক বন্ধু বিলিকে এই কুসুমভা গ্রামেই ছেড়ে দিয়ে যান। এই গ্রামে নাজিম সাহেব ক্ষেতি-বাড়ি করতেন। একটি জানালাহীন স-বারান্দা মাটির ঘর ছিল তাঁর সেখানে। আমরা সেখানে গিয়েই উঠতাম। ক্ষেতি-বাড়ি আসলে বাহানা। তাঁর বিবিদের বোকা বানাবার জন্যে। আসলে নানা জানোয়ার শুয়োর, শম্বর, শজারু, খরগোশ, চিতল হরিণ যে সব ফসল খেতে ভালবাসে, সেই সবের ক্ষেত করতেন সেখানে আর বিবিদের হাজারিবাগ বাজারের মুদির দোকান থেকে উৎকৃষ্ট চাল, ডাল ইত্যাদি কিনে নিয়ে গিয়ে বলতেন কুসুমভার ক্ষেতে হয়েছে।

আগেই বলেছি নাজিম সাহেবের ইংরেজি জ্ঞানের কথা—আরেকটি উদাহরণ দিই। একবার আমি, গোপাল আর নাজিম সাহেব কাটকামচারির জঙ্গলে গেছি, উঠেছি এক মুসলমান বিড়িপাতার ছোট কারবারির বাড়িতে। সেখানের গভীর এবং চমৎকার জঙ্গলে পৌঁছে দিলখুস হয়ে গেল আমাদের। যেদিন পৌঁছলাম সেদিনই যাঁর অতিথি হয়েছিলাম আমরা, বললেন, এক মেমসাহেব এসেছিলেন এখানে হাজারিবাগ থেকে তাঁর সাহেবের সঙ্গে। জার্মান মেমসাহেব। সাহেবের নাম উইলি। কী হাত কী হাত! ইক ধারসে গোলি অন্দর তো সাথ্থেসাথ উস ধারসে জান বাহার।

নাজিম সাহেব বললেন, ওঁদের তো আমি চিনি। বোকারো না কোথায় উইলি সাহেব কাজে এসেছেন জার্মানি থেকে।

তারপর বললেন, হ্যাঁ উইলি সাহেবের হাত খুবই ভাল ছিল—গোলি

ব্রেইনসে ঘুসকর ভেইন সে যা কর ঠোসে নিকাল যাতা থা। 'ঠো' অর্থাৎ 'টো'। তারপরে বললেন, তব হাঁ। এক বাত। মেমসাব বড়ি ফ্রাঙ্ক মেমসাব থি।

আমি অবাক হলাম। যে মানুষ তেরো নাম্বার ছেলে বোঝাতে ওল্ডেস্ট সান বলেন, তাঁর সঙ্গে জার্মান মেমসাহেব ইংরেজিতে কী এমন কথোপকথন করলেন যে নাজিম সাহেবের ফ্র্যাঙ্ক মনে হল তাঁকে।

আমি বললাম, কেইসি ফ্র্যাঙ্ক থি?

নাজিম সাহেব বললেন, আরে ক্যা বোলে, ঠান্ডাকি রাত থি, হামলোগ সব আগকা সামনামে বৈঠকর কুসুমভামে গপসপ করা রহা থা, বিরিয়ানি বন রহা থা, ঔর মেমসাহেব হুঁয়াহি বৈঠকর হিসি কর রহি থি। বড়ি ফ্রাঙ্ক থি।

ওই ফ্র্যাঙ্কনেসের অভব্য গল্প আমি 'কোয়েলের কাছে'তে যশোয়ন্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছি, আপনারা যাঁরা 'কোয়েলের কাছে' পড়েছেন তাঁরা পড়ে থাকবেন।

বিরিয়ানির কথাই যখন উঠল তখন বলতেই হয় নাজিম সাহেবের মতো উমদা বিরিয়ানি খুব কম মানুষকেই বানাতে দেখেছি। আপনারা যদি আজও কেউ হাজারিবাগে যান তবে হাজারিবাগ ক্লাবের কাছে আগের পুলিস ট্রেনিং ক্যাম্পের উল্টোদিকে একটি ছোট্ট দোকান দেখতে পাবেন। হান্নান মিঞার দোকান। হান্নান মিঞা আজ আর নেই কিন্তু তাঁর ছেলে আছে। ওদের দোকানের বিরিয়ানি, চৌরি, চাঁব, পায়া অথবা কাবাব আগে অর্ডার দিয়ে গেলে নাজিম সাহেবের বিরিয়ানির স্বাদের সামান্য আন্দাজ পাবেন।

একবার নাজিম সাহেবের সঙ্গে চাতরায় গেছিলাম শিকারে। ডাকবাংলোয় উঠেছিলাম। কলকাতা থেকে বিরাট দল এসেছিল গোপালের বন্ধুবান্ধবের, তাদের মধ্যে শিকারি কম, উৎসাহীই বেশি। সূর্য উঠতে না উঠতে সিঙাড়া আর জিলিপি খেয়ে সারাটা দিন আমরা নির্জলা উপোস দিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে চার-পাঁচটি বড় হাঁকোয়া করেছিলাম। শিকার হয়েছিল শুধু একটি সজারু—সুব্রতর ভাই মুকুল মেরেছিল। দিনশেষে বেশ কয়েকমাইল পাহাড়ে উপত্যকাতে হেঁটে যখন ডাকবাংলোতে সন্ধের মুখে ফিরি তখন দূর থেকে বিরিয়ানি রান্নার গন্ধ ক্ষুধার্ত আমাদের নাকে ভেসে আসছিল। আহা! সে কী খুশবু! আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল, সে গন্ধ আজও নাকে লেগে

আছে। নফর আলির দাদা সফর আলির তদারকিতে সে বিরিয়ানি রান্না হয়েছিল। সে বিরিয়ানির কথা জীবনে ভোলার নয়। হাতমুখ ধুয়ে ইজিচেয়ারে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, নাজিম সাহেব যখন খেতে ডাকলেন, তখন জনা দশ-বারো ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত যুবক যে পরিমাণ বিরিয়ানি যে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলাম তা বলার নয়।

যদিও নিমকহারামি হবে তবুও বলা দরকার এই সফর আলি নফর আলি বছর পনেরো-কুড়ি পরে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলির চোরাচালানের জন্যে অ্যারেস্টেড হয়েছিল। সফর আলিরও দোকান ছিল দিশি বন্দুকের। নাজিম সাহেবের মতনই।

এক শীতে, সম্ভবত ১৯৫৭-৫৮-তে হবে, আমি আর গোপাল নাজিম সাহেবের সঙ্গে লাল মোটর কোম্পানির বাসে চড়ে এক দুপুরে জৌরিতে যাব বলে চড়ে পড়লাম। তখন শীতও পড়ত বটে হাজারিবাগে। চাতরা পৌঁছে নাজিম সাহেব পান্তুয়া আর সিঙাড়া খাইয়েছিলেন 'ছুঁওড়াপুত্তানদের'। উনি ভালবেসে আমাদের 'ছুঁওড়াপুত্তান' বলে ডাকতেন। অমন পান্তুয়া আর সিঙাড়া অগণ্যবার খেয়েছি পালাম্যুর লাতেহারের কাছারির উল্টোদিকের পণ্ডিতের দোকানে।

যখন রাত নেমে গেছে, তখন গয়ার বাস হালকা চাঁদের আলোতে একটি ছোট্ট জনপদে দাঁড়াল। জায়গাটার নাম জৌরী। নামবার যাত্রী শুধুমাত্র আমরাই ক'জন। যাত্রীবোঝাই, জানলার খড়খড়ি তোলা বাস থেকে নেমেই ঠান্ডাটা ঠিক কীরকম তা মালুম হল। সামনেই একটি ছোট্ট মসজিদ, চাঁদের আলোতে তার সাদা রঙ আরও পরিষ্কার হয়েছে। পাশেই একটি ছোট্ট খাপরার চালের বাড়ি। সেটা মৌলবির বাড়ি। নাজিম সাহেবের বন্ধু। নাম ভুলে গেছি। দেখলাম একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে বড় চৌকির ওপরে জাজিম পাতা। তার ওপরে জনা দশেক মানুষ বসে হুঁকো খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। মৌলবি তো উদ্বাহু হয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর বাড়ির বাইরে এসে গাড়ু করে আনা জলে পথের ওপরে হাতমুখ ধুলাম। যা ঠান্ডা, তাতে শরীরের কোথাওই জল ছোঁয়াতে ইচ্ছা করছিল না। হাতমুখ ধোওয়া হলে গাছতলাতে হিসি করে আবার ঘরে ঢুকলাম। ততক্ষণে খাবার এসে গেছে। মোটা মোটা বাজরার তৈরি রুটি তাক করে চৌকির ওপরে মস্ত থালাতে

সাজানো আছে। আর পাশে লালনীল ফুলের কাজ করা একটি বিরাট এনামেলের গামলা—তার মধ্যে খুব ঝাল-মশলা দেওয়া সুগন্ধি মুরগির ঝোল। সকলেই দেখলাম দু হাতে রুটি নিয়ে ছিঁড়ছেন আর সেই গামলার মধ্যে হাত ডুবিয়ে ঝোলে রুটি ভিজিয়ে মুরগির ঠ্যাং অথবা বুক দিয়ে পরমানন্দে খাচ্ছেন। আমরাও তাই করলাম। তখন ছেলেমানুষ, খুব খিদে পেত।

খাওয়া হল। তারপর আবার গাড়ুর জলে হাতমুখ ধোওয়া পথে এসে। ওই গাড়ু নিয়েই সকালে মৌলবি সাহেব এবং তাঁর বাড়ির স্ত্রী পুরুষে প্রাতকৃত্য সারতে বাইরে যাবেন কিনা কে জানে। কোনওরকম বিকার থাকলে সিদ্ধিলাভ হয় না। আমার ঠাকুরমার ঘরের দেওয়ালে কালোর ওপরে সাদায় লেখা একটি বাণী কাচ-বাঁধানো ছিল। 'লজ্জা মান ভয়, তিন থাকতে নয়।' সেই সঙ্গে 'বিকার' যোগ করে দেব ঠিক করলাম কলকাতায় ফিরে।

খাওয়া তো হল, এখন শোওয়া? শুনলাম, এখন মাদ্রাসা ছুটি—মসজিদের উল্টোদিকে রাস্তার ওপারেই খাপরার চালের একটি ছোট্ট ঘর। সেটিই মাদ্রাসা। মেঝের ওপর প্রচুর পরিমাণ খড় ফেলে রাখা হয়েছে এবং একটি করে দুর্গন্ধ নোংরা কম্বল তিনজনের জন্যে। শৌখিন গোপাল সবসময়ে সঙ্গে আতর রাখত। সে একটু করে 'রূহ অম্বর' তিনটি কম্বলের ওপরেই ছড়িয়ে দিল। তাতে কিন্তু কম্বলের গন্ধ আরও উগ্র হল।

আমরা ঠিক করলাম যে-জামাকাপড় জুতো পরে আছি তাই পরেই শুয়ে পড়ব, প্রয়োজনে মিষ্টিগন্ধের খড় চাপা দেব গায়ে। তাও ভি আচ্ছা। একটা রাতও নয়, আমরা চারটের সময়ে অন্ধকার থাকতে গরুর গাড়ি চড়ে যার যার বন্দুক জড়িয়ে ফল্গু নদীর দুই শাখানদী জাঁম আর ইলাজান পেরিয়ে যাব সিজুয়াহারা নামের এক পাহাড়ে, রঘু শাহর ভাণ্ডারে। সেই রঘু শাহর বউ নাকি রঘু শাহর মুহুরীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে অনেকই বউ-পালানো পুরুষ দেখেছি কিন্তু আমার জীবনে রঘু শাহই প্রথম বউ-পালানো পুরুষ—তাকে দেখার তীব্র আগ্রহ নিয়ে চোখ বুঁজলাম। ঘরের এক কোনায়, নাজিম সাহেবের হেফাজতে একটি ধোঁয়া-ওঠা লণ্ঠন জ্বলছিল। তাতে আলোর চেয়ে ধুঁয়ো বেশি হচ্ছিল। তবু ওই হাড়কাঁপানো শীতের

রাতে কেরোসিনের মিষ্টি গন্ধ বেশ লাগছিল। কিন্তু চোখ বুজতেই বিপত্তি। প্রায় এক হাত লম্বা বড় বড় ছুঁচো চিঁক চিঁক চিঁক করে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে শায়ীন আমাদের ওপর দিয়ে গোলকিপারের মতো বডি থ্রো দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তাদের হরকৎ দেখে ঘোরাঘুরি নয়, ওড়াউড়িই মনে হচ্ছিল।

নাজিম সাহেব আফটার-ডিনার জ্বলন্ত সিগারেটটা ভাল করে ঘষে ঘষে মেঝেতে নিভিয়ে দিয়ে বললেন, আরে ছুঁওড়াপুত্তান, চুহা ক্যা করতা হ্যায়, জানতে হ্যায়?

বললাম, ক্যা?

আদমি কো বদনকা সবসে নরম জাগা খা লেতা হ্যায়।

ছুঁচো যে সদ্যোজাত শিশুর মাথার ঘিলু খেয়ে যায় তা আমি ওড়িশার পুরুনাকোটের জঙ্গলে জেনেছি।

আতঙ্কিত হয়ে বললাম, তব ক্যা হোগা? হামারা নাক খা লেগা ক্যা?

নাজিম সাহেব ছুঁচোর চিঁক চিঁক-এর মতো ছিঁক করে হেসে বললেন, মর্দকি বদনমে নাকসেভি জাদা নরম জাগা হোতা হ্যায়। ঔর উও খা লেনেসে আপলোগোঁকি আব্বালোগ যিতনাভি পইসাওয়ালা হো, উসকি কোঈ স্পেয়ার-পার্টস দুনিয়া ঢুন্ডকর নেহি মিলেগা। আভি বিয়া শাদীভি নেহি হুয়া আপলোগোঁকি—উও খা লেনেসে কভ্‌ভি বিয়াশাদী হোগা ভি নেহি।

কী সর্ব্বোনেশে কথা। গোপাল স্বগতোক্তি করল, 'সব্বোবাঁশ'। বিশ্বটাঁড়ে একলা খাসির মতো ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি লালা? এ নাজিম মিঞা কী বিপদে ফেললে গো!

এই 'বিশ্বটাঁড়' শব্দটিও গোপালের নিজস্ব COINAGE। আর এমনভাবে তা ও উচ্চারণ করত যে তার জবাব ছিল না।

আমি বললাম, তা আর বলতে। বলে, নিজের উরুসন্ধি পরম যতনে দু হাতের পাতা দিয়ে ঢেকে, গায়ে খড়চাপা দিয়ে দুর্গা দুর্গা বলে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু মৌলবি সাহেবের বাড়িতে যে বাজরার রুটি খেয়েছিলাম তা আজও হজম হয়নি। পেট ব্যথা করলেই মনে হয়, এ সেই যবনের বাড়ির রুটি, এ কি সহজপাচ্য হয়? নাজিম সাহেবের কথা আলাদা। এই ভব সংসারে নাজিম সাহেব একটিই প্যায়দা করেছিলেন খোদা।

নাজিম সাহেবের কথা কিছুই বলা হল না স্থানাভাবে। তার ভালবাসার ঋণ এ জীবনে শোধবার নয়। হাজারিবাগ থেকে বানাদাগ যাওয়ার পথে যে কবরখানা পড়ে সেখানে শুয়ে আছেন এখন উনি। আমি ওঁর মাজারে কলকাতা থেকে পাঠানো একটি মার্বেলের ফলক লাগিয়ে দিয়েছি, আমাদের সব বন্ধুদের নাম লিখে। যখনই যাই হাজারিবাগে, ওই মাজারে মোমবাতি আর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে আসি।

এই পঙ্‌ক্তি কটি লিখতে বসে মনে পড়ল শুধু মহম্মদ নাজিমই নন, আমার জঙ্গলের জিগরি দোস্ত গোপাল এবং সুব্রতও আজ নেই। সুব্রত ব্লাড ক্যান্সারে চলে গেছে প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। এ. বি. কাকুও চলে গেলেন দু' হাজার ছ' সালের জানুয়ারিতে। চব্বিশ তারিখে তাঁর শ্রাদ্ধ। তাঁর বড় সমন্ধী ফুটুদা তো গেছেন বছর দুয়েক আগেই। এখন চলে যাবার দিন এসেছে কেউ আগে কেউ পরে।

নাজিম সাহেব একটি হিন্দি দোঁহা গাইতেন, তার মানে হল—তুমি এ পৃথিবীতে যেদিন এসেছিলে সেদিন সবাই হেসেছিল আর তুমি কেঁদেছিলে। এখানে এমন কাজ করে যেও যে যাবার দিনে তোমার জন্যে যেন সবাই কাঁদে আর তুমি হাসতে হাসতে যেতে পারো।

গোপাল একদিন ফোন করে বলল, শুনছ লাল সাহেব, নিউজ অফ দ্যা ইয়ার।

কী?

নাজিম মিঞা নাকি গাড়ি কিনেছেন।

বলো কি?

তাই তো শুনছি। আর গাড়ি কিনেছেন আমাদেরই জন্যে, যাতে শিকারে যেতে অসুবিধা না হয়।

বললাম, শোনা কথা বিশ্বাস কোরো না। ভুতোকে পাঠাও হাজারীবাগে ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করে আসবে।

অতএব আমরা চাঁদা করে ভুতোর ট্রেন ভাড়া আর রাহা খরচ দিয়ে তাকে হাজারীবাগে পাঠালাম। থাকতে তো পয়সা লাগবে না। পূর্বাচলেই থাকবে।

নাজিম সাহেব তাঁর একাধিক বিবি এবং দশ-বারোটি সন্তান, তার উপর

অল্পবয়সে মারা যাওয়া দাদার পরিবারেরও তাবৎ ভার বহন করে কোনোক্রমে সংসার প্রতিপালন করতেন। অর্থ ছিল না কিন্তু আনন্দর কোনো ঘাটতি ছিল না। হৃদয়ের ঔদার্যরও কোনো অভাব ছিল না। ঠিক ওই ধরনের মানুষ পৃথিবী থেকে ক্রমশই কমে যাচ্ছেন। সাইকেলের হ্যান্ডেলে টিফিন ক্যারিয়ার ঝুলিয়ে তাতে গরম গরম বিরিয়ানি ও নানা উমদাপদ নিয়ে চলে আসতেন আমাদের জন্যে। তখনও তাঁর বাড়ি এমন ছিল না তা আমাদের মতো, ওঁর ভাষায়, কলকাতার 'রহিস' আদমিদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো যায়।

সে কারণেই নাজিম সাহেবের গাড়ি কেনার ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্যই মনে হলো আমাদের।

কিন্তু ভুতো পার্টি সরেজমিনে তদন্ত সেরে কলকাতাতে ফিরে রিপোর্ট যা দিল তা শুনে আমাদের চক্ষুস্থির। ভুতো বলল, সবই সত্যি। পাটনার এক বুড়ি বাইজির কাছ থেকে নাজিমসাহেবের পুরনো দোস্তীর কারণে, যাকে আমরা বলি 'ফর ওল্ড টাইমস সেক', মাত্র পাঁচশো টাকাতে বাইজির নাইন টুয়েন্টি এইট-এর টি. মডেল ফোর্ড গাড়ি ড্রাইভার সমেত কিনে ফেলেছেন। এখন যে ড্রাইভার সে আগে বাইজির তবলচি ছিল। গলায় মাফলার জড়িয়ে এক সময়ে বাইজির সঙ্গে কত জমিদার জোতদারদের ম্যায়ফিলে তবলা বাজিয়েছে। বাইজির জেল্লা কমে যাওয়ায় গলাতে সুর না-লাগায় সাম্প্রতিক অতীত থেকে ড্রাইভারীতে শামিল হয়েছে। গাড়িও নাইনটিন টুয়েন্টি এইট মডেলের, ড্রাইভারও তাই। তার নাইনটিন টুয়েন্টি এইটের পাজামাটি ছিঁড়ে গিয়ে এখন আন্ডারওয়ার হয়ে গেছে। গাড়ির উপরে আমরা গেলে পর ধকল যাবে বলে গাড়ি এখন পারফেক্ট রেস্ট-এ আছে।

গোপাল সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, কী রকম?

মানে গাড়ি ইটের উপরে বসে আছে যেন মস্ত একটি মুরগি—ডিমের উপরে তা দেবার জন্যে বসে আছে।

গাড়িও লা-জওয়াব। সলিড রাবারের টায়ার, কাঠের স্পোক।

গাড়ির পাশেই ড্রাইভার বসে রোদ পোয়াচ্ছে। নাজিম সাহেব বলেছেন, ছঁওড়াপুত্তানলোগোঁকো জলদি জলদি আনে বোলো। ইক পোস্ট-কার্ড ডালকে চলা আনা, জম্‌কে শিকার খেলেঙ্গে।

অতএব এক শীতের সকালে হাজারীবাগ রোড স্টেশনে বম্বে মেইল থেকে নেমে বন্দুক কাঁধে করে বাস স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশা নিয়ে সোজা নাজিম সাহেবের বাড়ি।

নাজিম মিঞা তো আমাদের দেখেই রাত জেগে আসা ক্ষুধার্তদের জন্যে আন্ডার ভুজিয়া আর দেশি ঘি-এ ভাজা পরোটা বানাতে বিবিদের অর্ডার করে গাড়ির প্রশংসাতে মাতলেন। আমাদের খাওয়া হলে বললেন, আভ্ভি ঘর যাকর ডাটকে খাও আর মুতকে শো যাও। ম্যায় গাড়ি লেকর ঠিক সাত বাজে পৌঁছেগা পূর্বাচল মে।

ঠিক সাতটাতে আমরা রেডি হয়ে বসে রইলাম। হাজারীবাগের শীত, গ্রীষ্ম আর মশা এই তিনের তুলনা সত্যিই ছিল না। মশার কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করতে করতে রাত প্রায় নটা বাজল এমন সময় গেট এর সামনে কী একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু এসে দাঁড়াল। অমন উদ্ভট দর্শন জানোয়ার আমরা আগে কেউই দেখিনি। সেই গাড়ি নামক জন্তুটিকে ব্যাক করল ড্রাইভার। সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে দুর্বাশামুনির চোখ দিয়ে যেমন আগুন বেরোবার কথা তেমন আগুন বেরোচ্ছিল।

তখন ব্যারেথিয়া নামের একরকমের জলপাই-সবুজ গরম কর্ডুরয় পাওয়া যেত। অ্যামেরিকান আর্মির অফিসারদের শীতের পোশাক সেই কাপড়ে বানানো হত। আমিও শখ করে একটি ফুলহাতা সাফারি স্যুট বানিয়েছিলাম ওই কাপড়ের। আমি, গোপাল আর নাজিম সাহেব তাঁর আদরের ধন, পরম রতন গাড়ির পেছনের সিটে বসেছি। কিন্তু গাড়িতে উঠে বসামাত্রই আমার পেছনে কে যেন কামড়ে দিল। চমকে লাফিয়ে উঠতেই বুঝলাম যে ট্রাউজারের দেড় গিরে কাপড় সীটেই আটকে রইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রাউজারটা ফেটেও গেল এবং তজ্জনীত ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে হাজারীবাগের হিমেল উত্তুরে বাতাস হু হু করে ঢুকতে লাগল।

ব্যাপারটা কী তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, পেছনের সীটে ন্যাংটো কয়েল-স্প্রিং এর উপরে গোটা দুই উর্দু খবরের কাগজ গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা আছে। আমার পশ্চাতদেশ সেই কয়েল স্প্রিং স্পর্শ করতেই প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে সেই স্প্রিং আমাকে আক্রমণ করেছে।

আর্তনাদ করে উঠে বললাম ঈ ক্যা? নাজিম সাহেব নির্বিকারভাবে বললেন, জংগলকি গাড়ি ওইসাই হোতা হ্যায়।

তারপর বিটোফোনিক অর্কেস্ট্রা বাজাতে বাজাতে টিং টিং টং টং ঢিক-ঢাক, চুঁই চুঁই নানা শব্দর তরঙ্গ তুলে গাড়ি কুড়ি মাইল স্পিডে এগোতে লাগল সীমারীয়ার পথে। একটু পরেই খেয়াল করলাম যে গাড়ির পেতলের হেডলাইট দুটি যা প্রায় ফিটন গাড়ির কেরোসিনের বাতির মতো বড়। ডানদিকে বাঁদিকে চকচক শব্দ করে সরে সরে যাচ্ছে।

গোপাল বলল, ঈ কা বাত নাজিম সাহাব?

নাজিম সাহেব গোপালকে দাবড়ে দিয়ে বললেন, ঈয়ে হ্যায় জংলকি গড্ডি। গাড্ডি লাজোয়াব। হেড লাইট ইকদফে রাস্তা দিখায়গা ঔর দুসরা দফে জাংগল।

আমরা চুপ করে গিয়ে চকাচক শব্দ শুনতে লাগলাম। সেই গাড়ির মকরমুখো লম্বা এয়ার-হর্নটি মাঝে মাঝেই কঁরর—র-র-র করে পিলে-চমকানো ডাক ছাড়তে লাগল। তাতে কতজন দুর্বল হৃদয়ের গ্রামবাসী যে হার্ট-ফেইল করে মারা গেল তা ঈশ্বরই জানেন।

জঙ্গলে ঢোকার পরে আরেক বিপত্তি। এতদিন এঞ্জিন বিশ্রামে থাকায় এবং ইটের পাঁজার উপরে বসে থাকাতে তার মধ্যে নেংটি ইঁদুরে বাচ্চা পেড়েছিল ও সপরিবারে সেখানে বসবাস করছিল মহানন্দে। এখন এঞ্জিন আচমকা গরম হতে তারা ছ্যাঁকা খেয়ে উত্তেজনাতে লাফালাফি করতে করতে আমাদের গায়ে-মাথায় হুটোপুটি করতে লাগল।

এবার ভুতো বলল আপত্তি জানিয়ে, ঈ ক্যা বাত মিঞা?

নাজিম সাহেব ভুতোকে ডেঁটে দিয়ে বললেন, আররে ছাঁওড়াপুত্তান স্রিফ পাঁচশোহি রুপাইয়ামে গাড্ডি ঔর ড্রাইভার মুনায়াকো পাটানকি তিতলি বাইজি সে—তো ঈ গাড্ডি ক্যা রোলস্-রয়েস নিকলে গা?

তারও পরে আরও গভীর জংগলে ঢোকার পরে সামনের সিটে বসা ভুতোর মাথাটা একবার উঁচু আরেকবার নিচু হতে লাগল। আমরা পেছনের সিটে বসে তা দেখে হতবাক। গোপাল বলল, এই ভুতো তোমার কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি তো।

—তবে তোমার মাথাটা উঁচু-নিচু হচ্ছে কেন?

—সে কি? আমি তো বুঝতে পারছি না। ভুত-প্রেতে থাপ্পড় মারছে না তো! মিঞার গাড়ির কত গুণ।

নাজিম সাহেব চটে ওঠে বললেন, ও ভুচু। আমাকে যা পারো বলো, আমার গাড়ি সম্বন্ধে একটি কথাও বলবে না।

ভুতো বলল, ও ড্রাইভার সাব। গাড্ডি রোকিয়ে। ম্যাস ইন্‌সপেকশান করুঙ্গা।

ড্রাইভার ভুতোর কথা মান্য করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল বনপথে।

ভুতো দরজা খুলে নেমে পড়ে তার পকেটে গোঁজা এক ব্যাটারির ছোট টর্চকে দিয়ে ভাল করে চাকাগুলো পরীক্ষা করল ট্রেইন-ইনসপেক্টরের মতো। এবং পরক্ষণেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। তাকে হাসি না বলে আর্তনাদ বলাই ভাল।

কী হয়েছে? খুব চিন্তান্বিত হয়ে জিগগেস করল গোপাল।

ভুতো বলল, টায়ারগুলো তো সলিড টায়ারের। অ্যামেরিকান টায়ার। আমরা যেমন 'ফোরেন' জিনিস দেখলেই হামলে পড়ি, হাজারীবাগী ছুঁচোরাও ওই সুখাদ্যের উপরে হামলে পড়ে রাবার খেয়ে গেছে যত্রতত্র। সেই ফুটি-ফাটা টায়ারের ওপরে দিশি টায়ারের রাবার গজাল দিয়ে সেঁটে দিয়েছেন। চাকা যেই ঘুরছে অমনি সেই পুলটিস দেওয়া জায়গাগুলোর সঙ্গে মাটির সংযোগ হতেই গাড়ি উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং সেই পুলটিস পেরুনোর পরই নিচু হয়ে যাচ্ছে। যাক, ভূত বা পেতিন এ যে ধরেনি ওই যথেষ্ট।

আবার গাড়ি ছাড়া হলো। কয়েক ফার্লং যাবার পরই দেখা গেল লাল-মাটির পথের উপরে একটি কজওয়ে। পাহাড়ী এলাকাতে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট পাকা ব্রিজ বানিয়েছে ছোট নদীর উপরে। বর্ষার সময়ে ওই সব নদীতে জলস্রোত এমনই তীব্র হয় যে তার জোরে ব্রিজ ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সিমেন্ট পাথর অথবা কন্‌ক্রিট দিয়ে রাস্তার উপরটা বাঁধিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই জায়গাতে পিলার বসিয়ে দেওয়া হয় পথের নিচে। জলস্রোত তার উপর দিয়ে বয়ে যায়। তবে সেই স্রোতের স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ থাকে না কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সাংঘাতিক হয় অবস্থা। অনভিজ্ঞদের কত গাড়ি যে ভেসে গেছে ভরা বর্ষাতে বিভিন্ন কজওয়েতে তা বলার নয়।

তবে এখন তো শীতকাল। কজওয়েকে ভয় নেই। নাজিম সাহেবের গাড়ি যেই সেই কজওয়ের উপরে গিয়ে পৌঁছেছে অমনি ড্রাইভার ইয়া আল্লা!

বলে লাফিয়ে তিনি তার ড্রাইভিং সিটে এবং নিরুপায় আমাদের সকলের চোখের সামনে নাজিম সাহেবের 'গাড্ডি লাজোয়াব' কজওয়ে থেকে বালি ভরা শুকনো নদীর বুকে গড়িয়ে পড়ল। আমরা ছত্রখান হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটকে গেলাম।

নাজিম সাহেব আহত বাঘের মতো বালি মেখে উঠে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে বললেন, হারামজাদা!

ড্রাইভারও ততক্ষণে ভূপতিত অবস্থা থেকে উত্থিত হয়েছে। সেও প্রবল বিক্রমে নাজিম সাহেবকে বলল, গালি মত দিজিয়ে।

নাজিম সাহেব বললেন, হামারা ফাসক্লাস গাড্ডিকি এহি হাল কিয়া হ্যায় তুমনে ঔর গালি নেহি দেগা। তো ক্যা চুমেগা তুমকো কামবকত্ কাঁহাকা।

ড্রাইভার বলল, ম্যায় মেরি জান বাঁচায়গা না আপকি গাড্ডি বাঁচায়গা? এক চুহা ঘুষ বৈঠাথা হামারা আন্ডারউয়ার মে। ক্যা করুঁ ম্যায়?

ঐ ভারী গাড়ি ধূলিশয্যা থেকে তোলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা মাথা নিচু করে হাজারীবাগের দিকে হাঁটা দিলাম। রোরুদ্যমান নাজিম সাহেব কাঁদতে কাঁদতে স্বগতোক্তি করতে লাগলেন হায়! হায়! মেরী গাড্ডি লাজোয়াব। মেরী গাড্ডি লাজোয়াব।

কাটার উপরে নুনের ছিটে দিয়ে ভুতো পার্টি বলল, যেইস্যা মালিক ওইস্যাহি গাড্ডি। তার পর ব্যঙ্গোক্তি করে বলল হুঁ! গাড্ডি লাজোয়াব! গিনেস বুক মে নাম লিখোয়া লিজিয়ে ঘর পৌঁছকর।

[অনেক কথা, এবং অনেকের কথাই বলা হলো না সময়াভাবে এবং আমার স্ত্রী হঠাৎই অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়াতে। ইচ্ছে রইল দ্বিতীয় খণ্ডে তা লেখার। আপনাদের ভাল লাগল কি না তা প্রকাশককে অথবা আমাকে জানালে বাধিত থাকব। আমার ঠিকানা, সানী টাওয়ার্স, ৩, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিন্যু, কলকাতা-৭০০০১৩]